# স্বস্তিকা

দাম : ৭০ টাকা

পূজা সংখ্যা - ১৪২৫
১ অক্টোবর - ২০১৮

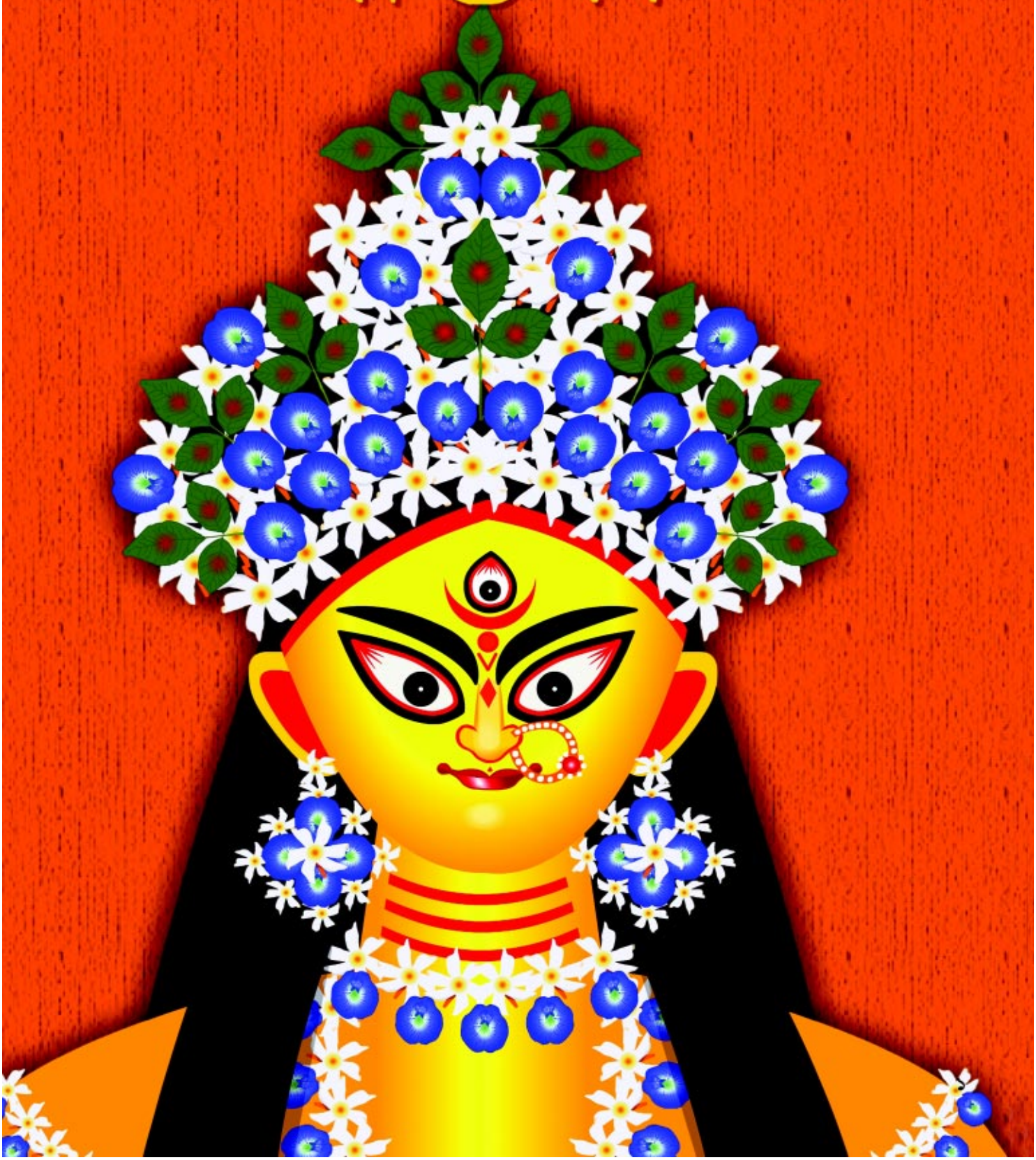

# স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৫ সংখ্যা,
১৪ আশ্বিন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১ অক্টোবর - ২০১৮,
যুগাব্দ - ৫১২০,
Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়**

**রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**
**হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর (সার্কুলেশন)**
**৮৬৯৭৭৩৫২১৪**
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
**হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর (অফিস)**
**৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

**দাম : ৭০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


**দেবী প্রসঙ্গ**
'নাশায় চাশুভ ভয়স্য মতিং করোতু'
স্বামী যুক্তানন্দ — ১৯

## উপন্যাস

অবেক্ষণ

শেখর সেনগুপ্ত ১৩৩

কুসুম কুমারী
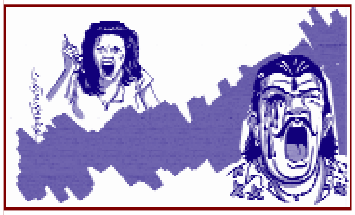
সুমিত্রা ঘোষ ২১৩

হাতি ঘোড়া পাল কী

জিষ্ণু বসু ২৬৫

উপন্যাসোপম কাহিনী
মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

প্রবাল চক্রবর্তী ৬৮

## গল্প

সে এক মেয়ে
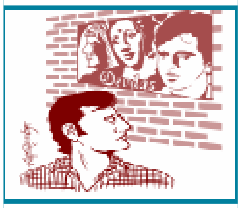
রমানাথ রায় ৪১

জয়-পরাজয়
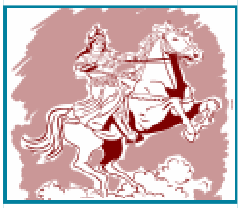
এষা দে ৫৯

অন্ধকারের গল্প

গোপাল চক্রবর্তী ১২৩

প্রথম বিদুর
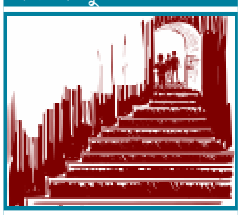
সন্দীপ চক্রবর্তী ১৭৯

ছোঁয়াছুঁয়ি

সিদ্ধার্থ সিংহ ২৯৯

দুষ্টু-মিষ্টি প্রাণী লিমার

তাপস অধিকারী ৩০৭

## প্রবন্ধ


শরৎ ঋতুতেই পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষের সমন্বয়

অধ্যাপক জয়ন্ত কুশারী ২৩

খোসা ও শাঁস
হেস্টি-বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম বিতর্ক ও ঐতিহাসিক পত্রযুদ্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস ৩১

বৃটিশ সংবাদপত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সারদা সরকার ৪৭

তোমার সৃষ্টির পথ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত ১১৫

গীতা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ

ড. সুদীপ বসু ১৯৫

আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণা-বিস্তৃতির প্রয়াসে নিবেদিতার ভূমিকা

দেবীপ্রসাদ রায় ১৯৯

আরব সভ্যতায় ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার অবদান

সৌমেন নিয়োগী ২০৫

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

অধ্যাপক জয় সেন ২০৯

একপর্দা প্রেক্ষাগৃহের মায়া

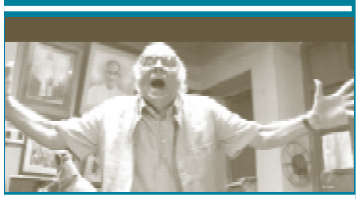

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৩

রাজনীতিতে ভক্তি, ভীতি ও ভ্রষ্টাচার : গণতন্ত্রের অন্তরায়

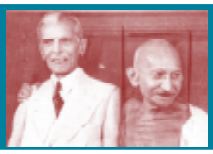

ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫৯

### ভ্রমণ

রেনেসাঁর ভূমিতে

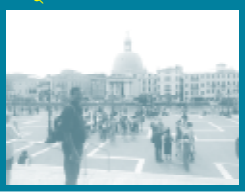

কুণাল চট্টোপাধ্যায় ১৫৩

### ফিরে দেখা

ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

ডা. অমূল্যরতন ঘোষ ২৭

### জীবন-কথা

মশাল হাতে সিংহপুরুষ

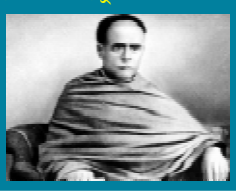

জহর মুখোপাধ্যায় ২৪৯

### মজার খেলা

অঙ্কের ধাঁধা

হিতোরি : জাপানি সংখ্যার খেলা

হিতোরি ধাঁধা

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩ | ৫ | ০ | ৪ | ০ | ৮ | ০ | ১ |
| ০ | ৪ | ১ | ৮ | ৭ | ২ | ৩ | ৫ |
| ১ | ৬ | ২ | ০ | ৮ | ০ | ৪ | ০ |
| ৪ | ৭ | ০ | ৩ | ২ | ৪ | ০ | ৬ |
| ৫ | ০ | ৪ | ০ | ৩ | ৬ | ৭ | ২ |
| ০ | ৩ | ৭ | ১ | ৪ | ০ | ২ | ০ |
| ৪ | ৮ | ৩ | ০ | ৫ | ১ | ০ | ৭ |

শৌনক রায়চৌধুরী ৩০৯

# SURYA

*Energising Lifestyles*

Innovative **DESIGN** » World-Class Quality **PRODUCTS** » Just One Name **SURYA**

*lighting*

*fans*

*appliances*

*pipes*

**SURYA ROSHNI LIMITED**

E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in

Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

**Toll Free No.: 1800 102 5657**

/suryalighting I /surya_roshni

# ‘নাশায় চাশুভ ভয়স্য মতিং করোতু’

স্বামী যুক্তানন্দ

শ্রীভগবান শ্রীমদভগবদ্গীতায় নিজমুখে ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

‘যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।’ (৪।৭-৮)

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেবী ভগবতী সকল দেবতা তথা জগদ্বাসীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন—

‘‘ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষময়ম্।।” (১১।৫৫)

অর্থাৎ, এরূপে যখন যখনই জগতে দানবগণ হতে উপদ্রব উপস্থিত হবে, তখন তখনই আমি অবতীর্ণা হয়ে দেশশত্রু অসুরগণকে বিনাশ করব।

দেবী ভগবতীও আপন প্রতিশ্রুতি পালনে শ্রীভগবানের মতোই যুগে যুগে অবতীর্ণা হয়ে অশুভ শক্তি, অসুর শক্তিকে দমন করে শুভশক্তি দেবশক্তিকে পুনরায় তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে দেবী কতবার জগতে অবতীর্ণা হয়েছেন বা হবেন, সেকথারও উল্লেখ রয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতেই। সেখানে একাদশ অধ্যায়ে দেবী দেবগণকে লক্ষ্য করে বলছেন—

‘‘বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাব্যুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ।।
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী।।” (১১।৪১-৪২)

অর্থাৎ, বৈবস্বত মন্বন্তরে (সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম —২৮তম) চতুর্যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য দুই মহাসুর উৎপন্ন হবে। তখন আমি নন্দগোপ -গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বিন্ধ্যাচলে অবস্থান পূর্বক সেই দুই অসুরকে বিনাশ করব।

‘‘পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্।।
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তদন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমী-কুসুমোপমাঃ।।
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্।।” (ঐ, ১১।৪৩-৪৫)

অর্থাৎ, পুনরায় আমি অতিভয়ঙ্করী মূর্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়ে বিপ্রচিত্তি-বংশীয় দানবগণকে বধ করব। সেই উগ্রস্বভাব বিপ্রচিত্তি-বংশীয় মহাসুরগণকে ভক্ষণ করতে করতে আমার দাঁতগুলি দাড়িম্বফুলের মতো রক্তবর্ণ হবে। সেজন্য স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্যে মানবগণ আমাকে স্তব করতে করতে সবসময় ‘রক্তদন্তিকা’ নামে অভিহিত করবে।

‘‘ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যা মনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ
সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা।।
ততঃ শতেন নেত্রাণাং
নিরীক্ষিষ্যামিযন্মুনীন্।
কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতক্ষীমিতি মাং
ততঃ।।” (ঐ, ১১।৪৬-৪৭)

অর্থাৎ, পুনরায় শতবছর ব্যাপী অনাবৃষ্টির কারণে পৃথিবী জলশূন্যা হলে মুনিগণ কর্তৃক সংস্তুতা হয়ে আমি জলশূন্য পৃথিবীতে অযোনিসম্ভবারূপে আবির্ভূতা হব। তখন স্তবকারী মুনিগণকে আমি শতনয়ন দ্বারা নিরীক্ষণ করব। সেজন্য মানুষরা আমাকে ‘শতাক্ষী’ নামে অভিহিতা করবে।

ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহ-সমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ! শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহংভুবি।।” (ঐ, ১১।৪৮-৪৯)

অর্থাৎ, হে দেবগণ, তারপর আমি নিজ

‘‘যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলংবলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিল-জগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং কারাতু।।”
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।৪)

দেহজাত জীবনধারক শাক, পাতা দিয়ে যতদিন সুবৃষ্টি না হয়, ততদিন পর্যন্ত সকল জীবগণকে পালন করব। আর তখন আমি পৃথিবীতে 'শাকম্ভরী' নামে বিখ্যাত হব।

'তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাধ্যং মহাসুরম্।

দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মেনাম ভবিষ্যতি।। (ঐ, ১১।৫০)

আর তখন আমি দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করব। সেজন্য আমার নাম 'দুর্গাদেবী' নামে বিখ্যাত হবে।

দেবী তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার কথাপ্রসঙ্গে দেবগণকে আরও বলছেন— 'পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।

রক্ষাংসি ক্ষয়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ।।

তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ।

ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।।' (ঐ, ১১।৫১-৫২)

অর্থাৎ, পুনরায় আমি যখন হিমালয়ে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে মুনিগণের পরিত্রাণের জন্য রাক্ষসদের বিনাশ করব, তখন সকল মুনিগণ প্রণতদেহে আমাকে স্তব করবেন। সেজন্য আমি 'ভীমাদেবী' নামে বিখ্যাত হব।

'যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।

তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্।।

ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।

ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তিসর্বতঃ।। (ঐ, ১১।৫৩-৫৪) অর্থাৎ, যখন অরুণ নামে অসুর ত্রিভুবনে মহাবিঘ্ন উৎপাদন করবে, তখন আমি অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট ভ্রামরী মূর্তি ধারণ করে ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য সেই মহাসুরকে বধ করব। সেজন্য সকলে সর্বত্র আমাকে 'ভ্রামরী' নামে স্তব করবে।

দেবী নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুগে যুগে বারেবারে অবতীর্ণা হয়েছেন, হচ্ছেন এবং হবেন শিষ্টের পালনে ও দুষ্টের দমনে, দেবধর্ম-সনাতন ধর্ম-হিন্দুধর্মের সুরক্ষায় এবং দানবের ধর্ম, অসুরের ধর্ম, অত্যাচারীর ধর্ম বিনাশের জন্য।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জগত্তারিণী দেবী মহাশক্তি মহামায়ার তিনবার অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। প্রথমবার তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল সৃষ্টি তখনও শুরু হয়নি। সৃষ্টি যিনি করবেন, সেই সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ব্রহ্মার জীবনরক্ষা করার প্রয়োজনে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উৎপন্ন দুই অসুর মধু ও কৈটভ যখন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত, তখন তিনি প্রাণপণে ডেকেছেন শ্রীবিষ্ণুকে— নিজ জীবনরক্ষার প্রয়োজনে। কিন্তু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত শ্রীবিষ্ণুর কানে তাঁর সেই ডাক পৌঁছায়নি। কারণ তিনি যে তখন অতুলা তামসীশক্তি বিশ্বেশ্বরীর প্রভাবে নিদ্রামগ্ন। তাই শুরু করলেন সেই মহাদেবী জগদ্ধাত্রীর স্তুতি করতে। ব্রহ্মার স্তবে প্রসন্না দেবী হলেন আবির্ভূতা। জাগ্রত হলেন শ্রীভগবান বিষ্ণুও। ব্রহ্মাকে হত্যায় উদ্যত মধু ও কৈটভের সঙ্গে তাঁর শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ। পাঁচ হাজার বছর ধরে সে যুদ্ধ চললেও শ্রীবিষ্ণু তাদের পরাজিত করতে পারলেন না। তখন দেবী মহামায়া দুই অসুরকে করলেন বিমোহিত 'মহামায়া বিমোহিতৌ'। মোহিত হয়ে বিবেচনা হারিয়ে তখন সেই দুই অসুর শ্রীবিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করতে বলে। বিষ্ণুও তাদের মৃত্যুবর চাইলেন ও তাঁর সুদর্শনের আঘাতে শিরচ্ছেদ করলেন।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, ভগবান বিষ্ণু দুই অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের হত্যা করলেও সেখানে দেবীই দুই দৈত্যের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। কারণ, প্রথমত, দেবী মহামায়া শ্রীবিষ্ণুকে নিদ্রা থেকে জাগরণের যেমন কারণ, তেমনি দুই দৈত্যকে বিমোহিত করে নিজেদের মৃত্যুকে নিজ হাতে তুলে নেওয়ার যে কাজটি তারা করেছে, তা তো দেবী মহামায়ার মায়ারই কারণে। তা না হলে তাদের হত্যা করতে ভগবান বিষ্ণুর যে আরও কতদিন সময় লাগত বা কবে সম্ভব হতো তা বলা কঠিন। তাই প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে মধু-কৈটভের মৃত্যুর কারণ দেবী ভগবতীই।

দেবী মহাশক্তি মহামায়ার দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের কথাটিও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত। সেখানে দেখা যায়, দেবগণ দীর্ঘদিন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত ও স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত। তাঁরা তখন বাস্তুহারা। সর্বহারার ন্যায় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই সময় তাঁরা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে সব কথা বলেন। তাঁর সহযোগিতা নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হন বিষ্ণু ও শিবের নিকট। তাঁদের কাছে সব কথাই সবিস্তারে বলেন। তারপর তিন প্রধান দেবতা ও অন্যান্য দেবগণের মহাতেজ ও সুবিপুল তেজোরাশির সম্মিলনে আবির্ভূতা হলেন। সকল তেজের আধার, সকল শক্তির আধার মহাশক্তি শ্রীশ্রীমহিষাসুরমর্দিনী। দেবগণই তাঁকে সর্বতভাবে সমরসাজে সজ্জিতা করে দিলেন। সেই মহাশক্তি মহামায়ার নিকট প্রবল পরাক্রমসহ যুদ্ধ করেও নিহত হল ত্রিভুবনের অধীশ্বর অসুরসম্রাট মহিষাসুর। দেবগণ দেবীর কৃপায় আবার নিজ বাসভূমি ফিরে পেলেন। জগতে শুভশক্তি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। বিনাশ ঘটল অশুভ শক্তি, দুষ্ট শক্তি। সনাতন ধর্ম আবার হলো সুস্থিত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত এরপরের ঘটনা মহাবীর ও মহাযোদ্ধা শুম্ভ ও নিশুম্ভের নেতৃত্বে অসুর শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। তাদের স্বর্গরাজ্য অধিকার করার সংকল্প। সেই সংকল্প নিয়ে তারা স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে। দেবগণের পরাজয় ঘটে। আবারও তাঁরা হন স্বর্গহারা। একই সঙ্গে সব ক্ষমতাও চলে গিয়ে তাঁরা দীনহীনভাবে দিন কাটাতে থাকেন। এভাবেই দিনযাপন করতে করতে একসময় তাঁদের মনে হয়, দেবী মহাদেবী সর্বেশ্বরী তো তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, যখন যখনই অশুভ শক্তি প্রবল হয়ে উঠবে, শুভশক্তি হবে ক্ষীণ, দুর্বল; তখন তখনই তিনি আবির্ভূতা হয়ে দেবশক্তি, শুভশক্তি, সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবেন। সেই ভাবনা ভেবেই দেবগণ দেবী মহাদেবীর শরণাপন্ন হলেন। স্তব স্তুতি প্রার্থনা জানালেন দেবীর নিকট।

শুভশক্তির প্রতীক দেবগণের প্রার্থনায় পরিতুষ্টা হয়ে দেবী হলেন আবির্ভূতা। তিনি ও তাঁর সৃষ্ট মাতৃশক্তিকে নিয়ে প্রবল যুদ্ধে বিনষ্ট করলেন দুই মহাসুরসহ সমগ্র অসুরকুলকেই। দেবীর করুণাতেই আবার দেবগণ ফিরে পেলেন নিজ স্বর্গরাজ্য ও হারিয়ে যাওয়া অধিকার। জগতে শান্তির সুবাতাস আবার আপন ছন্দে প্রবাহিত হতে থাকল। সত্যধর্ম, সনাতন ধর্ম, হিন্দুধর্ম আবার হলো সুস্থিত।

মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যেমন জগদীশ্বরী দেবী মহাশক্তি যুদ্ধে একাই অসুরদলকে পরাভূত করেন কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি ও তাঁর সৃষ্ট মাতৃশক্তিকে নিয়ে যুদ্ধ করে দৈত্যকুলকে বিনষ্ট করেন। যদিও তাঁর কথাই সঠিক— 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়াঃ কমমাপরা' (১০।৫)। এই জগতে দেবী একাই আছেন, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপরোক্ত যে তিনটি ঘটনার কথা আমরা পড়ে থাকি বা শুনে থাকি, যা দেবী জগদ্ধাত্রীর জগৎ-কল্যাণ লীলারূপে অনুষ্ঠিত, সেগুলিকে কাহিনি, গল্প বা আখ্যান-উপন্যাস যাই বলা হোক না কেন, প্রতিটিই ইতিহাস। প্রতিটিই বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে।

আমাদের রামায়ণ, মহাভারত যেমন ইতিহাস, তেমনি বিভিন্ন পুরাণসমূহে বর্ণিত আখ্যান উপখ্যানগুলিও ইতিহাস। তবে এসবই অত্যন্ত প্রাচীন। এত প্রাচীন যে সেগুলির পাথুরে প্রমাণ রক্ষা করা অসম্ভব। নাসার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে যদি আমাদের ধারণা হয়, রামচন্দ্র রামসেতু তৈরি করেছিলেন আজ থেকে ১৭ লক্ষ বছর আগে, তাহলে সে ঘটনা আজ থেকে কতদিন আগের? এবং এখন যে কলিযুগ চলছে, এই কলিযুগ বৈবস্বত মনুর অধীন। এর বয়সের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বছর। যার মধ্যে মাত্র ৫০০০ বছর কী তার কিছু বেশি দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। এর আগে ছিল দ্বাপর যুগ, ত্রেতা যুগ ও সত্য যুগ। তাদের বয়স যথাক্রমে ৮,৬৪,০০০; ১২, ৯৬০০০ ও ১৭,২৮০০০ বছর।

এর আগে আছে চাক্ষুস, রৈবত, তামস, উত্তম, স্বারোচিষ ও স্বায়ম্ভুব মনুর যুগ এবং তাদের বয়স যদি বর্তমান মনুর সমান বয়স হয়ে থাকে, তবে সেই অঙ্ক কী সুবিশাল হয়ে যায়, তাকি ধারণা করা সম্ভব? আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে সুরথ রাজার কথা পড়ি বা শুনি, তিনি ছিলেন স্বরোচিত নামে দ্বিতীয় মনুর অধিকার সময়ের— 'স্বারোচিষেহন্তরে পূর্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ। সুরথো নাম রাজাহভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৪)। আর তাঁকে মহামুনি মেধস যে মধুকৈটভব বধ, মহিষাসুর বধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কথা শুনিয়েছেন, তারও বয়স বিচার করলে তো কম নয়। সুতরাং সেসবের পাথুরে প্রমাণ রক্ষা করা কীভাবে সম্ভব? হয়তো যে যে সময় এইসব ঘটনা ঘটেছে, সেই সময় যে এসবের প্রমাণ ছিল না তা নয়। কিন্তু কালে কালে সবই হয় নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা হারিয়ে গেছে। আজ আমরা যে সকল বস্তুর মধ্যে বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহকে ধরে রাখতে চাইছি, সেগুলিই বা সেভাবে কতদিন স্থায়ী হবে? মহাকালের অতলগর্ভে সবই একদিন বিলীন হবেই হবে। মহাকালের অতলগর্ভে আমরা যদি যেতে পারি, তবে হয়তো আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুরই প্রমাণ পাওয়া যাবে। এখনও তো মাঝেমধ্যেই শোনা যায়, মাটির গভীরে কত প্রাচীন যুগের প্রাণীর বা অন্যান্য বস্তুর নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং কোনওদিন হয়তো সেগুলিও পাওয়া গেলে আশ্চর্য কী? তবে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলেও যুগ যুগ ধরে যে কথা লোকমুখে, শাস্ত্রমুখে প্রচারিত হয়ে আসছে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় কি? বরং সেগুলিকে স্বীকার করেই এগিয়ে যেতে হয়, সেগুলি থেকে শিক্ষা নিতে হয়। পণ্ডিতগণ, বিজ্ঞজন তাই করেন। মহাজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত ব্যাসদেব সেই চিন্তা-ভাবনা করেই সেই দূরদৃষ্টি নিয়েই ওই সকল ইতিহাস মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই দেবী মাহাত্ম্যে উল্লেখ করেছেন জগতকল্যাণ লোক কল্যাণের উদ্দেশেই।

হিন্দু শাস্ত্রকার ও পণ্ডিতগণের তত্ত্বের প্রতি ঝোঁক বেশি। তাঁরা চান, যাঁদের পক্ষে সম্ভব, তাঁরা যেন সবসময়ই তত্ত্বচিন্তা মনের মধ্যে করেন। তার মধ্য দিয়েই তাঁরা সত্য বস্তু লাভ করতে পারবেন। তত্ত্বের মধ্যেই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের অনেক গভীর কথা, গোপন কথা লুকিয়ে আছে। যা জানতে পারলে, বুঝতে পারলে ত্রিবিধসমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যায়। সে কাজ অবশ্যই সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা অবশ্যই সেটি করবেন। কিন্তু তাই বলে শাস্ত্রের মধ্য সব কথার তত্ত্ব অযোগ্যকে বাছতে যাওয়া যেমন সঠিক নয়, তেমনি সবকিছুকেই সর্বদা তাত্ত্বিকভাবে দেখাও ঠিক নয়। যা আমাদের পণ্ডিতগণ, আমাদের অধ্যাত্মজগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ কেউই করেননি, করতে চাননি। তাঁরা জানেন এবং মানেন, শাস্ত্রকথায় যেমন তত্ত্ব আছে, তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তার উপযোগিতা আছে। যেমন সেখানে মুক্তির কথা বলা আছে, তেমনি আছে ভুক্তির কথাও। যার পক্ষে যেটি আয়ত্ত করা সম্ভব সে সেটিই নেবে এবং তার কাছে সেটিই উপযোগী হয়ে উঠবে। তাই বলে আমরা সকল মানুষকে এমনভাবে বুঝানোর চেষ্টা করতে পারি না বা করব না, 'মা কালীর হাতে যে রক্তাক্ত খড়্গ, সে খড়্গ কাউকে হত্যা করার জন্য নয়, সে খড়্গ জ্ঞান-খড়্গ। মা ওই খড়্গ দিয়ে অজ্ঞানীর মনের অন্ধকার ছেদন করবেন বলেই তো তিনি খড়্গধারী। বা যদি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, রাম বলেও কেউ ছিলেন না, রাবণ বলেও কেউ ছিলেন না। রাম হলেন মানুষের অন্তরস্থিত শুভবুদ্ধি আর রাবণ হলেন অশুভ বা তামসিক বুদ্ধি। এই শুভবুদ্ধির অশুভবুদ্ধির বিপক্ষে যে সংগ্রাম, তাই রামায়ণে এঁকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে গল্প আকারে। তাহলে সে ক্ষেত্রে যা দাঁড়ায় তা হল শ্রীশ্রীচণ্ডী ও রামায়ণ উভয়ই

কল্পিত। এর মধ্যে কোনও সত্য নেই, ইতিহাসও নেই। তাই সেগুলি পড়ার বা অনুসরণ ও অনুকরণ করারও প্রয়োজন নেই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখানো হয়েছে— দেবী চণ্ডিকা জগতে অশান্তি সৃষ্টিকারী দুষ্টদের দমন করার জন্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অসুরকে তাঁর খড়্গাঘাতে হত্যা করেছেন। আবার রামায়ণে দেখা যায়, সুস্থ শান্তিময় পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে দুষ্টদের বিনাশে শ্রীরামচন্দ্র আজীবন সংগ্রামে সংকল্পবদ্ধ। দু'ক্ষেত্রেই আমরা অনুপ্রাণিত ও নিশ্চিত। উভয়ের নিকট থেকেই আর্ত মানুষ বিপদ থেকে মুক্তির অভয় আশ্বাস লাভ করে। ঈশ্বর বিশ্বাসী বিশেষত হিন্দুদের অধিকাংশই যেসকল দেবতার পূজা করে তাঁরা মূলত শস্ত্রধারী — শিব, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, গণেশ ব্রহ্মাদ প্রমুখ। ব্রহ্মাদি তিন দেবতার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেও ব্রহ্মার পূজা খুব বেশি চোখে পড়ে না। তাঁর বড় অধিষ্ঠানক্ষেত্র হলো পুষ্করতীর্থ। তাছাড়া আর কোথায় কোথায় তাঁর পূজা হয় সে সংবাদ খুব কম লোকই জানেন। কিন্তু ওই সকল দেবগণের পূজা যত্রতত্রই হয়ে থাকে। হ্যাঁ, একথা ঠিক, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মতো কোনও কোনও দেবতার হাতে অস্ত্র নেই। কিন্তু হিন্দু তাঁদেরও ব্যাপকভাবে পূজা করে। তার কারণ, মা লক্ষ্মীর কৃপা না থাকলে অন্নাভাবে জীবন যাবে। আর মা সরস্বতীর করুণা না পেলে মূর্খ হয়েই থাকতে হবে। অন্নহীন হয়ে থাকার মতো প্রশ্নই নেই, মূর্খ হয়েই বা কে থাকতে চায়?

সুতরাং শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভুক্তি বা জাগতিক দিক আত্মরক্ষা ও শত্রুদমনের দিক, মায়ের দেবস্বভাব সন্তানদের রক্ষা করার প্রচেষ্টার দিকটি নিয়ে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে। সেখান থেকে শিখতেও হবে। আর মায়ের কাছ থেকে আমরা যে রূপ চাই, জয় চাই, যশ চাই, চাই শত্রুর বিনাশ— রূপং দেহি জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।' তাছাড়া মায়ের নিকট সৌভাগ্য, আরোগ্য, বিদ্বান, লক্ষ্মীবান, শক্তিমান হওয়ার মতো কত কিছু প্রার্থনা তো আছেই। যেগুলি সবই মা পরমেশ্বরীকেই পূরণ করতে হবে— এই জগদ্বাসীর কল্যাণে। তাঁর আর্ত, শরণাগত, ভক্ত সন্তানদের কল্যাণে।

তবে শ্রীশ্রীচণ্ডী তো সেই শাস্ত্র, যেখানে ভুক্তি ও মুক্তি উভয়েই পাওয়ার কথা বলা আছে। রাজা সুরথ হলেন ভুক্তি বা ভোগের প্রতীক। তিনি রাজ্য চান, রাজা হতে চান, ঐশ্বর্য চান, শত্রু বধ করতে চান, পরন্তু মন্বন্তরের অধিপতি হতে চান। জগতজননী মা তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ করেন। আবার সমাধি বৈশ্য সে পথে না গিয়ে বিবেকী, প্রজ্ঞাবান, বৈরাগ্যবান হয়ে স্ত্রী-পুত্র ধনাদি আমার এবং দেহাদি আমি— এ রকমের সংসারাশক্তি বিনাশক তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করেন। জগজ্জননী মা তাঁকে মুক্তিলাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। অতএব শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জাগতিক দুঃখ দূর করার উপায়, সম্পদ লাভের ও সমৃদ্ধির পথ যেমন প্রশস্ত হয়ে আছে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তির পথও প্রশস্ত হয়ে আছে। যিনি যেমন চান, তিনি তেমন সম্পদই পাবেন। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা কমিয়ে বা দেখেও তার ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়েও ভাবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পরন্তু সেই ভাব ও ভাবনাকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা যায় না।

স্বামী প্রণবানন্দজী কালীর হাতে রক্তাক্ত খড়্গ, দুর্গার হাতে দশপ্রহরণ দেখে হিন্দুকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বলেছেন। আত্মরক্ষায় ওইসব অস্ত্রশস্ত্র ধারণের শক্তি ও সামর্থ্য অর্জনের জন্য শক্তি-সাধনা করতে বলেছেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী হলো নারীশক্তি মাতৃশক্তি জাগরণের শাস্ত্র। এই শাস্ত্র থেকে শেখা যায়, যখন পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রে পুরুষশক্তি দুর্বল বা অকর্মণ্য হয়ে যায়, তখন যদি নারীশক্তি মাতৃশক্তি সেখানে জেগে ওঠে, পুরুষের পাশে দাঁড়ায়, তবে পুরুষ শক্তিলাভ করে এবং কর্মক্ষেত্রে জয়ী হয়। আবার পুরুষ ছাড়াও মাতৃশক্তিকে যদি উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে, উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কর্মভূমি বা যুদ্ধভূমিতে পাঠানো যায়, তবে সে অবশ্যই বিজয় নিয়ে আসবেই। বৃহত্তর যুদ্ধক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্ত্রীশক্তিকেই না পাঠিয়ে পুরুষেরাও যদি অনুগমন করে, তবে বিপক্ষ যত প্রবলই হোক না কেন, যুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত। এই সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধতা ও বিজয় লাভের যে সংকল্প নিয়ে দেবগণ দেবী মহাদেবী মা জগদ্ধাত্রীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন, তা থেকেও আমাদের শিখতে হবে। বুঝতে হবে, তাকে অনুসরণ, অনুকরণ করতে হবে। হিন্দুজাতি বিশাল, কিন্তু তার সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব তাকে হীন, দুর্বল, পরপদানত করে রেখেছে। যদি হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে, এক সঙ্কল্প নিয়ে চলতে পারে, তবে তাকে কে পদানত করবে? কে তার উপর অত্যাচার নির্যাতন করবে?

আজ দেবস্বভাব, সত্যধর্মনিষ্ঠ শান্তিকামী হিন্দু চারদিকে দৈত্য দানব অসুরদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত। যদিও সে আত্মরক্ষায়, স্বধর্ম ও স্বীয় সংস্কৃতি রক্ষায় যত্নশীল, কিন্তু প্রতিপক্ষের নিকট সে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই হিন্দুর এই দুর্বলতার জন্য একদল হিন্দুও দায়ী। এই অবস্থায় যেমন হিন্দু সমাজের নারীশক্তি মাতৃশক্তির জাগরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি একান্তভাবেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই মহাশক্তি মহামায়া মা দুর্গা যিনি মধু-কৈটভ বিনাশিনী, মহিষাসুরমর্দিনী, শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী— তাঁর পুনরায় আগমনের। এসে আবার তিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করুন। তাই তাঁর শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা জানিয়ে বলি—

ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব যাঁর অতুলনীয় প্রভাব ও শক্তি বর্ণনা করতে অসমর্থ, সেই দেবী চণ্ডিকা সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালন এবং আমাদের অমঙ্গলজনক ভয় বিনাশের জন্য ইচ্ছা করুন। ■

# শরৎ ঋতুতেই পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষের সমন্বয়

**অধ্যাপক জয়ন্ত কুশারী**

পূব আকাশে নিত্যদিন বিরাজ করেন জ্যোতির্ময় সূর্যদেব। তাঁরই নিত্যলীলায় আসে দিন। আসে রাত্রি। আলো-আঁধারির আবর্তনে জীবকুলের জীবনযাত্রাতেও আসে বৈচিত্র্যের স্বাদ। দিবাভাগের কর্মক্লান্ত ব্যস্ততার পরে বিশ্রামের বিরতি নিয়ে আসে রাত্রি। এইভাবেই কেটে যায় দিন। দিনের পর মাস। মাসের পর বছর। এ তো গেল সাধারণ মানুষের জীবনধারা।

কিন্তু ক্রান্তদর্শী প্রাজ্ঞ ঋষিকুল এর মধ্যেই দেখতে পেলেন তিথি-নক্ষত্র, বার, পক্ষ ও অয়নকে। এল পূর্ণিমা-অমাবস্যা- প্রতিপদ প্রভৃতি ষোলোটা তিথি। এল কৃত্তিকা প্রমুখ সাতাশটি নক্ষত্র। রবি ইত্যাদি সাতটি বার। হলো পক্ষের পরিবর্তন। অয়নের অতিক্রম। এলো শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ। একে একে উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ন এসে পড়ে। ধরিত্রীর বুকে যেমন উত্তরায়ণ পর্বের পরবর্তী অধ্যায়ে আবির্ভূত হয় দক্ষিণায়ন। ঠিক তেমনই সূর্যদেবের জীবনের দুটি পর্বের অবস্থা ও অবস্থানগত পরিবর্তনের প্রতীক এই অয়নদ্বয়ের পরিবর্তন।

যিনি এই ধরণীর দিন ও রাত্রির নিয়ামক, যাঁর কিরণে প্রতিভাত হয় দিনের আলো। আর অস্তগমনের পরে দিনান্তে নেমে আসে রাতের আঁধার, সেই ভাস্করদেবের জীবনপথও পরিবর্তন হলো দুটি ভিন্ন পথে। বিশ্ববিধাতার অমোঘ বিধানকে শিরোধার্য করেই। মাঘ থেকে আষাঢ়— এই ছয়মাস উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণ হলো দেবতাদের দিনের বেলা। সেই উত্তরায়ণের দিনগুলিতে উত্তরাভিমুখী হলেন সূর্যদেব। সূর্যদেবের এইসময়ের দিনগুলি কাটে তাঁর প্রথমা স্ত্রী সংজ্ঞাদেবীর সঙ্গে। শ্রাবণ থেকে পৌষ এই ছয়মাস দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রিবেলা। দক্ষিণায়নের আগমনে দেব দিবাকর তাঁর তেজোদীপ্ত বীর্যবত্তাকে পরিতৃপ্ত করতে ছায়াদেবীকে করলেন জীবনসঙ্গিনী। তপন তেজের উগ্র প্রখর প্রশমিত হলো শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ার আচ্ছাদনে। রাতের আঁধারের ঘন ছায়ায় গভীর নিদ্রামগ্ন হলেন দেবকুল।

এলো ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি দক্ষিণায়নের এই বিশেষ অন্তিম তিথিটি স্বাভাবিক নিয়মে অমাবস্যা হলেও এটি 'মহালয়া' নামে বেশি পরিচিত। শাস্ত্রে বিশেষ এই পক্ষটিকে 'অশ্বযুক কৃষ্ণপক্ষ' বলা হয়েছে। সপ্তাশ্ববাহিত রথেই সূর্যের গমনাগমন। এই পক্ষের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্কটি যে নিবিড়, তা 'অশ্বযুক' শব্দটির ব্যবহারে স্পষ্ট হয়। অশ্ব কথাটি এখানে সূর্যেরই দ্যোতক। মহালয়া শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখা যায়। মহান আলয়ঃ যত্র ইতি মহালয়ঃ (স্ত্রীয়াম টাপ্) স্ত্রীলিঙ্গে আ যোগে মহালায়া। উক্ত পুরাণের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মহান শব্দে ঋষিগণ বা পিতৃগণ, আলয় শব্দে রৌদ্রতীর্থ। সূর্যের তেজ ও আলোয় বিশ্ববাসী পান প্রাণের স্পর্শ। সেই প্রাণের স্পন্দন পেতে পিতৃগণ বা ঋষিগণ এসময় হন রৌদ্রতীর্থগামী। দক্ষিণাভিমুখী। যা সূর্যের এ সময়ের গতিপথ।

আবার মহালয়া শব্দটির ব্যুৎপত্তি অন্যভাবেও করা যায়। মহতো পিতৃপক্ষ লয়ঃ যত্র ইতি মহালয়ঃ (স্ত্রীয়াম্ টাপ্)। স্ত্রীলিঙ্গে আ যোগ করলে মহালয়া শব্দটি পাই। অর্থাৎ অশ্বযুক পক্ষের বা পিতৃপক্ষের অবসান যেখানে বা যে তিথিতে। এই কথার প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্নও কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। যার (যে তিথির) অবসান আছে তার (সেই তিথির বা পক্ষের) উদয়ও নিশ্চয় আছে! উত্তরে শাস্ত্র বলছে, ভাদ্র কৃষ্ণা প্রতিপদ হলো উক্তপক্ষের উদয় তিথি। দেবীপক্ষে (আশ্বিনের শুল্ক প্রতিপদ থেকে কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত) যেমন দেবীপূজন, পিতৃপক্ষেও তেমন পিতৃপূজনের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী পক্ষযুগল ও তাদের পুজো পদ্ধতির প্রয়োগগত দিকগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ফারাক আছে। ফারাক আছে উভয়ের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেও। পিতৃ পক্ষটি কৃষ্ণপক্ষবিহিত। তাই একে অশ্বযুক্ কৃষ্ণ বলা হয়। দেবীপক্ষটি শুক্লপক্ষীয় হওয়ায় সংকল্পবাক্যে শুক্লপক্ষ কথাটি উল্লেখ হয়। বাবা বেঁচে থাকলে পিতৃপক্ষের যে (কৃত্য) পিতৃপূজন অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণ করা যাবে না। দেবীপুজোর ক্ষেত্রে সে বাধ্যবাধকতা নেই। রীতি অনুসারে পিতৃপূজন বা শ্রাদ্ধ-তর্পণের ক্ষেত্রে দক্ষিণদিকটি বেছে নেওয়া হয়েছে। দেবী পুজোর জন্য শাস্ত্র উত্তর অথবা পূর্বদিকটি নির্দিষ্ট করেছে। এরকম অনেক অমিল থাকলেও মিলও রয়েছে বহুক্ষেত্রে। যেমন পিতৃ ও দেবীপূজনই তিথি মেনে হয়। তাই এদের তিথিকৃত্য বলা হয়। দেবীদুর্গার শারদকৃত্যের ক্ষেত্রে সাতটি কল্পের কথা বলা হয়েছে দুর্গোৎসব তত্ত্বে। সামর্থ্য ও অভিরুচি অনুযায়ী যে কোনও একটি কল্প অবলম্বনে এই কাজ করা যায়। পিতৃপূজনের ক্ষেত্রে এই পক্ষেও ছয়টি কল্পের একটি ধরে করা যায়।

শাস্ত্রে বলছে, 'অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষে তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ দিনে দিনে অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষ অর্থাৎ পিতৃপক্ষে প্রতিদিন পার্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। অসমর্থ হলে 'ত্রিভাগহীনং' অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে মহালয়া পর্যন্ত। তা না হলে 'সার্দ্ধংবা' অর্থাৎ অষ্টমী থেকে 'মহালয়া' পর্যন্ত। নইলে 'ত্রিভাগং' অর্থাৎ একাদশী থেকে মহালয়া পর্যন্ত। না পারলে 'সার্দ্ধসেবা' অর্থাৎ ত্রয়োদশী থেকে মহালয়া পর্যন্ত। তাও না পরলে মহালয়ার দিন মহালয়া নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, আর প্রত্যেকক্ষেত্রেই অবশ্যই তর্পণ। 'দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।' পিতৃপিতামহাদি এবং ত্রিভুবনের সকল প্রাণী আমার দেওয়া জলে তৃপ্ত হোন। এই আবেদন পৌঁছে দেওয়া হয় বিশ্ববাসীর কাছে। পক্ষকাল ধরে কোটি কোটি কণ্ঠে। প্রার্থনা সমবেত হলে তা ব্যর্থ হয় না। বিশ্বকল্যাণ কামনায় দেবী দুর্গার কাছে আমরা সমবেতই হই দেবীপক্ষে। পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য একটাই এই পক্ষযুগলের।

লক্ষ্য এক রেখে পথ দুটির সংমিশ্রণ করেছিলেন ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র। যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস বলা যায়। কোটি লক্ষ বানরসেনা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে লঙ্কায় উপস্থিত হলেন।

'কোটি লক্ষৈর্মহাবাহুর্লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।' লঙ্কার জল, স্থল, বৃক্ষ, প্রাকার বানররা ঘিরে থাকল। শ্রীরামচন্দ্র সুদৃঢ়া লঙ্কাপুরী দেখে ভাবতে লাগলেন, দুর্গাদেবীর আরাধনা ছাড়া শত্রুকে জয় করতে পারব না— 'ন বিনারাধনং দেব্যাঃ শত্রু জেতংক্ষমো ভবেৎ।' তাঁর কৃপা ছাড়া ত্রিলোকবিজয়ী বীরও তৃণবৎ শক্তিহীন। কিন্তু এই দক্ষিণায়নে দেবী নিদ্রিতা। অকালে দেবীকে কী প্রকারে পুজো করি? এরূপ চিন্তা করে শ্রীরামচন্দ্র পিতৃরূপিণী দেবীকে অর্চনা করতে সঙ্কল্প করলেন, আজ অপর (পিতৃ-পক্ষের) প্রতিপদ তিথি। আজ থেকে অমাবস্যা (মহালয়া) পর্যন্ত 'পার্বং নৈব বিধিনা' পার্বণ বিধিক্রমে পিতৃরূপিণী জয়দায়িনী দেবীর অর্চনা করব। 'প্রবৃত্তোহপরপক্ষশ্চ প্রতিপত্তিথিরদ্য তু।' এটা স্থির করে লক্ষ্মণকে বললেন, 'আজ পার্বণশ্রাদ্ধ করব।' লক্ষ্মণ! 'করিষ্যেপার্বণ শ্রদ্ধামপরাহ্নেহত্য ভক্তিতঃ।' একথা সকলেই মেনে নিলেন। শ্রীরামচন্দ্র দেবীকে চিন্তা করে পার্বণ শ্রাদ্ধ করলেন।

এই পিতৃপক্ষেই অবশ্য আরম্ভ হয় দেবীর মহাপুজোর প্রথম কল্প অর্থাৎ কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প। ভাদ্রী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষের নবমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত যে পুজো তাই প্রথম কল্প কৃষ্ণনবম্যাদিকল্প। 'আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্ দেবীম্।' অর্থাৎ আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে দেবীর বোধন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই মহাপুজোতে সাতটি কল্প— (১) কৃষ্ণনবম্যাদি (২) প্রতিপদাদি, শুক্ল প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত (৩) ষষ্ঠ্যাদি, শুক্লা ষষ্ঠী থেকে মহনবমী পর্যন্ত (৪) সপ্তম্যাদি। সপ্তমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত (৫) মহাষ্টম্যাদি। মহাষ্টমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত (৬) কেবল মহাষ্টমী (৭) কেবল মহানবমী।

শারদীয়া দুর্গা পূজা বাঙালির প্রধান উৎসব। মা দুর্গার আগমন বার্তায় বঙ্গজীবন যেভাবে আহ্লাদিত হয় তার বাস্তব রূপ আমরা দেখেছি। আমরা এও দেখেছি মা'র আগমনে বঙ্গসমাজ কীভাবে তাদের দৈনন্দিন সমস্যার কথা ভুলে ভুমানন্দে মেতে ওঠে। এই আনন্দের ঢেউ জাতীয় স্তর ছুঁয়ে আছড়ে পড়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বঙ্গজদের মনের বেলাভূমিতে।

শারদোৎসব যে শারদীয়া দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়, তা বুঝি বলার অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে দুর্গাপুজো মুখ্য। দুর্গোৎসব তারই অঙ্গমাত্র। পুজো ও উৎসব দুটিরই প্রয়োজন দুর্গোৎসবে বা দুর্গামহোৎসবে। কিন্তু কখনোই অঙ্গ প্রধানকে গৌণ করতে পারে না। অথচ বাস্তব উৎসবের বাহ্যিক আড়ম্বর আজ গ্রাস করেছে পুজোর মূল অনুষ্ঠানকে। মুখ্য সচেতকের ভূমিকা পালন করছে সর্বভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যা আকাডেমি এই সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে দুর্গাপুজো বিষয়ক শিবিরের আয়োজন প্রতিবছর নিয়মিত করে আসছে উক্ত সংস্থা। জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, ভৌগোলিক দূরত্ব ব্যতিরেকে সকল পেশায় নিযুক্ত মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। সংবাদমাধ্যম যার সাক্ষ্য বহন করছে।

দেবীপুজোর প্রথমদিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত রয়েছে যথেষ্ট

আকর্ষণ। এই পুজোর বিধিব্যবস্থা অর্থাৎ সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করে নিবন্ধকারগণ। এই বিধিব্যবস্থা সংবলিত সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে বলার অধিকার বেদের। শাস্ত্র বলছে 'তত্র বেদ প্রমাণম্।' বেদ যেখানে স্মৃতিশাস্ত্র অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র সেখানে বলার সুযোগ পাবে। এইভাবে তন্ত্র, কুলাচার, দেশাচারকে যথাক্রমে (বলার ক্ষেত্রে) প্রাধান্য দেওয়া হয়।

দুর্গাপুজো পৌরাণিক পুজো। এই পুজো বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালিকা দেবীপুরাণ মতে হয়। স্বাভাবিকভাবে পুজোর বিধিনিষেধের সংবিধান রচনায় বেদের একচেটিয়া প্রাধান্য এখানে কিছুটা খর্ব হয়েছে। তুলনায় প্রামাণ্যতা স্বীকার করা হয়েছে পুরাণকারের অভিমতকে। অখণ্ড বঙ্গদেশের ধর্মীয় অনুশাসনগুলি ভট্টাচার্য রঘুনন্দন প্রণীত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত। এই পুজোর ক্ষেত্রেও নন্দনের দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও দুর্গাপূজাতত্ত্বের প্রামাণ্যতা স্বীকার করা হয়েছে। নন্দন কোনও একখানি পুরাণ অবলম্বন করে তার প্রয়োগ রচনা করেন নানা পুরাণ ও নিবন্ধ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে রচনা করে গিয়েছেন। আলোচনায় প্রামাণ্য সমস্ত গ্রন্থই আজ দুর্লভ। বলাবাহুল্য, সেইসব পুরনো দিনের হারানো বচনগুলির ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিকগুলির কথা ভেবেই বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

আদ্যা প্রকৃতির নামই দুর্গা। শক্তি নিরাকার। কর্ম দ্বারা শক্তি অভিব্যক্ত হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই কর্ম। অতএব দুর্গা বিশ্বরূপা। জড় ও শক্তি একই পদার্থ। এটা আধুনিক ভূত বিদ্যাবেত্তাগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন। কল্পনার দ্বারা অগ্নি ও এর দাহিকা শক্তি পৃথক ভাবতে পারি। কিন্তু পৃথক করতে পারি না।

আধ্যাত্মিক অর্থে দুর্গা বিশ্বরূপা মহাশক্তি। আধিভৌতিক অর্থে পঞ্চভূতের মধ্যে দুর্গা অগ্নিরূপা। আধিদৈবিক অর্থে দুর্গা রুদ্রদেবের শক্তি। রুদ্র যজ্ঞিয়াগ্নি। যে অগ্নি নানারূপে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দ হতে পূজিত হয়ে আসছে।

মহেশের রূপ কল্পনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তিনি বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ, নিখিলভয়হর প্রসন্ন। দুর্গাও বিশ্বের আদি, বিশ্ব প্রকৃতি ও নিখিল ভয়হারিণী, ভক্তের প্রতি প্রসন্না।

বস্তুত আমরা ভাবের পুজো করি। মূর্তির পুজো করি না। দুর্গার মূর্তি থাকতে পারে না। তিনি বিশ্বাত্মা, শক্তিরূপিণী, চিন্ময়ী। অথবা বিশ্বই তাঁর অবয়ব। তিনি সকল অবয়বে বর্তমান। সে অবয়ব তাঁর প্রতীক। আমরা দুর্গামূর্তি বলি না। বলি দুর্গার প্রতিমা। গুণ ও কর্মের প্রতিমা। 'তস্য পুরুষস্য প্রতিমা শমুপমানম্ কিঞ্চিদ্বস্তু নাস্তি।' অর্থাৎ পুরুষের প্রতিমা নেই। প্রকৃতির আছে। প্রতিমা জড়ময়ী না হয়ে বাঙ্ময়ী হতে পারে। কিন্তু কে বা তাঁর গুণ ও কর্মের ইয়ত্তা করতে পারে? প্রতিমা ভাবস্ফুরণের আশ্রয় মাত্র। মহিষাসুরমর্দিনী প্রতিমা দেখলে ভক্তের মনে হয়, তিনি বিপন্ন দেবগণকে নির্ভয় করেছিলেন। প্রসন্না হলে তিনি ভক্তকেও স্বস্তি ও অভয় দিয়ে রক্ষা করেন। তাঁর প্রত্যেকটি রূপ রূপক বা ভাবরূপাত্মক প্রতীক। আমাদের মানসিক শক্তি অতি সীমিত। তাই 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' সেই ভগবতী সংসার অর্থাৎ সৃষ্টির আদি কর্ত্রী ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং প্রথমেই তাঁর স্মরণ।

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমো সূর্যোদয়ে যথা।।

যে প্রভাতে প্রত্যহ দুর্গা এই অক্ষরদ্বয় বিশিষ্ট দুর্গানাম স্মরণ করে, সুর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার ন্যায় তার বিপদসকল নষ্ট হয়। শাস্ত্রে দুর্গানাম স্মরণের কথা বলা হয়েছে। তাঁর রূপ তো দেখবার বা ভাববার শক্তি নাই। নাম করতে করতে এই একান্ত ভক্তি উদয় হলে তিনিই তাঁর রূপ দেখান।

কলিযুগে অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ করতে নিষেধ করেছেন শাস্ত্রকাররা। এখন প্রশ্ন হলো, কোনও ধনাঢ্য বা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে সাধ হলো। তাহলে সেই ব্যক্তির এই ইচ্ছে কি কোনওভাবেই সাকার হবে না? দেবীপুরাণ এবিষয়ে উদার মনোভাব দেখালেন। উক্ত পুরাণকার আবিষ্কার করলেন দুর্গোৎসব যথাযথভাবে ভক্তিসহকারে পালন করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল লাভ করা যায়। দেবীপুরাণের পুজো প্রকরণে এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

অশ্বমেধমবাপ্নোতি ভক্তিনা সুরসত্তম।
মহানবম্যাং পূজেয়ং সর্বকাম প্রদায়িকা।।

সব বর্ণের ও সকল জাতের মানুষ এমনকী দস্যুকেও দুর্গাপুজো করার সম্মতি দিল ভবিষ্যোত্তরীয় পুরাণ। উক্ত পুরাণে বলা হল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমনকী দস্যু বা ম্লেচ্ছজাতির কোনও ব্যক্তিও দুর্গাপুজো করতে পারবেন।

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানাম্লেচ্ছগণঃ পূজ্যতে সর্ব্বদাস্যুভিঃ।।

দেবীপুরাণ বলছে— নিজে পুজো করবে। অসমর্থ হলে অন্যের দ্বারা পুজো করাবে। 'স্বয়ং বাপান্যতোবাপি পূজয়েৎ পূজয়েত বা।' দুর্গাপুজো মহাপুজো। এক্ষেত্রে সাধ বা সাধ্যের একটা ব্যাপার থেকে যায়। অর্থ এবং সামর্থ্য দুটিই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার সমাধান করেছে ভবিষ্যপুরাণ। শুধু তাই নয়, পুণ্যার্জনের স্তর বিভাগ করা হয়েছে উক্ত পুজোয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। এখানে বলা হয়েছে, দুর্গাদেবী (প্রতিমা)র দর্শনমাত্রই পুণ্যজনক। দর্শন থেকে অভিবন্দন অর্থাৎ বন্দনা নমস্কার শ্রেষ্ঠ। বন্দনা থেকে স্পর্শ আর স্পর্শ অপেক্ষা পুজো করা শ্রেষ্ঠ।

দুর্গায়াধর্শনংপুণ্যং দর্শনাদভিবন্দনম্।
বন্দনাৎ স্পর্শনং শ্রেষ্ঠং স্পর্শনাদভিপূজনম্।।

দুর্গাপুজোতে উপাচারের ক্ষেত্রে প্রথমে বলা হয়েছে, চতুঃষষ্ঠি (চৌষট্টি) উপাচার। এরপর ষোড়শোপচার (ষোলো)। তারপর

দশোপচার (দশ)। অসমর্থ হলে পঞ্চোপচার (পাঁচ)। তাও না পারলে গন্ধপুষ্প দিয়ে পুজো করতে হবে। এটুকুও যোগাড় করতে না পারলে 'কেবলং জলেন বা' অর্থাৎ শুধুমাত্র জল। তবে এই জল যেন ভক্তি মেশানো থাকে অবশ্যই। তাই বলা হল 'অথবা ভক্তিতোয়াভ্যাম্'। এককথায় যথাশক্তি উপাচার দিয়ে মায়ের পুজো করবে। কিন্তু পুজো কোনওভাবেই বন্ধ করা যাবে না। কেননা, দুর্গাপুজোর নিত্যত্ব ও কাম্যত্বরূপ উভয়ত্বগুণ থাকায় এই পুজো না করলে পাপ হয়। আর করলে পুণ্য হয়। এবিষয়ে দেবীপুরাণ বলছে, প্রত্যেক বছর দ্ব্যত্বব ও চরলগ্নে আর রবিলগ্ন গত হলে দুর্গার পত্রী (কলাবৌ) প্রবেশ ও বিসর্জন করবে।

দ্বিশরীরে চরে চৈবলগ্নে কেন্দ্রগতে রবৌ।
বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জনম্।।

এখানে 'বর্ষে বর্ষে' 'প্রতিবর্ষম্' এরূপ বীপ্সার্থে দ্বিবচন দুর্গাপুজোর নিত্যত্বসাধক দেবীপুরাণের এই শ্লোকের শেষে বলা হয়েছে এভাবে মনুষ্যগণও ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল লাভ ও অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য দেবীর পুজো করবে।

এবমন্যৈরপি সদা দেব্যাঃ কার্যং প্রপূজনম্।
বিভূতিমতুলাংলব্ধং চতুর্বর্গপ্রদায়িকাম্।।

শারদীয়া দুর্গাপুজো যে একটি ব্রত। তা দেবীপুরাণের এই বচনে ধরা পড়েছে, হে সুর রাজেন্দ্র, দেবীভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে, শঙ্করাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত এই মহাপুণ্য মহাব্রত অবশ্য কর্তব্য।

মহাব্রতং মহাপুণ্যং শঙ্করাদ্যৈরনুষ্ঠিতং।
কর্ত্তব্যং সুররাজেন্দ্র দেবীভক্তিসমন্বিতৈঃ।।

এবিষয়ে ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে, ব্রত গ্রহণ পূর্বক সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী— এই তিনদিন দেবীর পুজো করবে। 'ব্রতী প্রপূজয়েদেবীং সপ্তস্যাদিদিনত্রয়ে।' ভবিষ্যপুরাণে এই বচনেও দুর্গাপুজোর ব্রতত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শারদীয়া দুর্গাপুজোর প্রকার তিনটি— সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী। রঘুনন্দন তাঁর দুর্গোৎসব তত্ত্বে স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ থেকে এই তিন প্রকার পুজো সম্বন্ধে উদ্ধৃ করেছেন—

শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিরিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চৈতি তাং শৃণু।
সাত্ত্বিকা জপ যজ্ঞাদৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্।।

সাত্ত্বিকী হলো, জপ-যজ্ঞ-নিরামিষ নৈবেদ্য দেবী মাহাত্ম্য (চণ্ডী) পাঠ ইত্যাদি। রাজসী হলো, সামিষ নৈবেদ্য — মাছ, মাংস যুক্ত ভোগ প্রভৃতি উপহার জপ যজ্ঞ ছাড়া। তামসী হলো, মন্ত্র ছাড়া মদ্য-মাংস সহযোগে কিরাত (ব্যাধ) সম্মতভাবে পুজো।

শারদীয়া দুর্গাপুজোকে মহাপুজো বা দুর্গামহোৎসব বলা হয়। গ্রাম্যজনেরা বলে থাকেন দুগ্গা মোচ্ছব। আর সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিথিকে মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী বলা হয়। শুধু তাই নয়, দুর্গাপুজোর সঙ্কল্পবাক্যে বলা হয় 'শারদীয়া দুর্গামহোৎসবে' অথবা 'শারদীয়া দুর্গামহাপূজায়াং' উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই 'মহা' শব্দের প্রয়োগ? এই প্রশ্ন অনেকের। এটা কি পুজোর ব্যাপ্তিরাজি দিয়ে নাকি পুজোর বাজেটের দিক দিয়ে নাকি জনসমাগম অথবা আড়ম্বরের আধিক্যের জন্য এই মহা শব্দের প্রয়োগ?

তাই যদি হয় তাহলে তো কোনও বিশেষ অঞ্চলের কালী কিংবা একটি বিশেষ অঞ্চলের জগদ্ধাত্রী পুজো কোনও কোনও ক্ষেত্রের শারদোৎসবের ব্যাপ্তি জনসমাগম অথবা আড়ম্বরকে হার মানিয়ে দেয়। তাহলে তো কালীপুজো কিংবা সেই জগদ্ধাত্রী পুজোর ক্ষেত্রে মহোৎসব, মহাপুজো উক্ত পুজোগুলির তিথির আগে 'মহা' শব্দ বসানো যেতে পারে। কিন্তু তা হয় না। কারণটা কী?

এ বিষয়গুলির সুষ্ঠু সমাধান করেছে লিঙ্গপুরাণ আর দেবীপুরাণ। লিঙ্গপুরাণ বলছে, শরৎকালের মহাপুজোতে চারটি কর্ম আছে এবং ওই মহাপুজো মঙ্গলকারিণী। ভক্তিপূর্বক সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে সেই মহাপুজো করা উচিত। আর এই চারটি কর্ম হল, মহাস্নান, পূজন, বলিদান, হোমযজ্ঞ। একই সঙ্গে চারটি কাজ শারদীয়া দুর্গাপুজোয় হয়ে থাকে। কালীপুজো বা জগদ্ধাত্রী পুজোয় বড়জোর একসঙ্গে তিনটি কাজ হয়। তাই উক্ত পুজোগুলির বেলায় 'মহা' শব্দ বসানো যাবে না।

শারদীয়া মহাপুজো চতুঃকর্মময়ী শুভা।
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ।।
তচ্চ স্নপন পূজন বলিদান হোমরূপা।

চতুঃকর্মময়ী অর্থাৎ স্নপন (অর্থাৎ মহাস্নান)-পূজন-বলিদান -হোম। এছাড়াও মার্কণ্ডেয় পুরাণে (চণ্ডীতে) বলা হয়েছে, 'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।' দেবীপুরাণে বলা হয়েছে, বর্ষাকালে আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও নবমী তিথিতে মহাশব্দ লোকের মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। এককথায় দুর্গাদেবীর (শারদীয়া) পুজোতে অষ্টমী ও নবমী যথাক্রমে মহাষ্টমী ও মহানবমী বলে খ্যাতি লাভ করবে। আর যেহেতু উক্ত পুজোর সপ্তমী তিথির পুজোয় মহাস্নান, পূজন, বলিদান, হোম এই চারটি কাজ একসঙ্গে হয়ে থাকে তাই সপ্তমীর বেলায়ও মহাসপ্তমী বলা হবে।

প্রাবৃটকালে বিশেষণে আশ্বিনে হ্যষ্টমীবুচ।
মহাশব্দো নবম্যান্তু লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি।।

দেবীর 'শারদা' নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কালিকাপুরাণ বলছে, 'যেহেতু পুরাকালে শরৎকালীন কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে দেবগণ দেবীর বোধন করেছিলেন, তাই তিনি পীঠস্থানে এবং ত্রিলোকে (স্বর্গ, মর্ত, পাতালে) 'শারদ' নামে বিখ্যাত হয়েছেন।'

শরৎকালে পুরা যস্মান্নবম্যাং বোধিতে সুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ নামতঃ।। ■

# ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

**ডা. অমূল্যরতন ঘোষ**

প্রায় ত্রিশ বছর আগে (প্রবন্ধটির প্রকাশকাল মার্চ, ১৯৪১ খ্রি.— অনুবাদক) ডা. হেডগেওয়ারের ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বাংলায় স্বদেশি আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তখন জোরকদমে চলছে। তৎকালীন দেশনেতারা 'দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' নামে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল যে সমস্ত ছাত্র জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের কারণে সরকার বা সরকার পোষিত বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন, অথবা যাঁরা সরকারি প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত কোনও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করতে ইচ্ছুক তাঁদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করা। যে ছাত্ররা এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন তাঁদের জন্য সরকারি চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের দ্বার অবারিত ছিল না। এঁদের চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য প্রয়াত ডা. সুবোধ কুমার মল্লিক, এম ডি, এম এস (এডিনবরা); প্রয়াত মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ দেশনেতারা একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি অভিহিত হয়েছিল 'দ্য ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য কলেজ অব্ ফিজিশিয়নস অ্যান্ড সার্জেনস' নামে। আমি ১৯১০ সালে হেডগেওয়ার, অ্যানে সাভারকার ও অন্যান্য মারাঠি ছাত্রদের সঙ্গে এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হই। প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের একটি সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্ত, এমনকী ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের ছাত্ররাও এখানে পড়তে এসে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় নিজেদের দীক্ষিত করতেন। সেইসময় এই মহাবিদ্যালয়টিকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল সার্থক-নামা এবং তার 'ন্যাশনাল' অভিধার সঙ্গে সুসংগত।

কলেজ জীবনে মারাঠি ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য আমি উপভোগ করেছিলাম। কলকাতায় তাঁদের আস্তানা ছিল কলেজের কাছে কানাই ধর লেনের একটি দোতলা বাড়ি। প্রায়শই আমি সেখানে যেতাম এবং তাদের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক বিতর্ক, এমনকী শারীরিক কসরতেও অংশ নিতাম। আবার তাঁরাও আমার বাসায় আসতেন। আমি সেদিনের একটি ঘটনা আজও স্পষ্টভাবে মনে করতে পারি। একদিন শ্রেণীকক্ষে অধ্যাপকের অনুপস্থিতির সুযোগে আমি হেডগেওয়ারকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান জানালাম যে তিনি তাঁর শরীরের সমস্ত বল দিয়ে আমার বাহুতে ঘুঁষি মারুন, আমি অচল থাকবো। তিনি আমার এই চ্যালেঞ্জ আমাকেই ফিরিয়ে দিলেন এবং হাতের পেশি শক্ত করলেন। আমি আমার মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে তাঁর পেশিবহুল বাহুতে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগলাম। গোটা শ্রেণীকক্ষ এই প্রতিযোগিতার ফলাফলের দিকে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রইল। হেডগেওয়ারকে এক ইঞ্চিও নড়ানো গেল না। আমি ঘুঁষি মেরে তাঁকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হলাম। হেডগেওয়ারের সহন-ক্ষমতা ও নিরুত্তাপ পরাক্রম আমাকে মুগ্ধ করল। আমার মারাঠি বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে হেডগেওয়ারই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিলেন। একবার একটি বিবাদে বহু অবাঙালি ছাত্র কলেজ ছেড়ে চলে যান। কিন্তু হেডগেওয়ার ও অন্যান্য মারাঠা বন্ধুরা কলেজ ত্যাগ করেননি শুধুমাত্র আমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে। রাজনৈতিক বৈঠক ও সমাবেশ কলকাতায় সেইসময় প্রায়শই হতো এবং মারাঠা ছাত্ররা নিয়মিত এই ধরনের অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। এঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবি লিয়াকত হোসেন এবং তৎকালীন অন্যান্য নেতাদের প্রতি। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন তাঁরা। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের হৃদয়গ্রাহী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই 'বন্দে মাতরম্' ভালো গাইতে পারতেন এবং অন্যান্যদের রচিত স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক সংগীত শুনতেও পছন্দ করতেন। মহাবিদ্যালয়-জীবনের চারটি বছর কাটিয়ে, চিকিৎসা-বিদ্যার পাঠক্রম শেষ করে তাঁরা নিজ নিজ প্রদেশে ফিরে যান।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯২৬ সালে ডা. হেডগেওয়ার একবার কলকাতায় এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন এক যুবক, যদি খুব ভুল না করি তবে তাঁকে ডা. মুঞ্জের পুত্র বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এর আগের বছর কলকাতায় আয়োজিত সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সম্মান সম্মেলনে যোগদানরত ডা. অ্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল আমার। তিনি আমায় ডা. হেডগেওয়ার ও অন্যান্য মারাঠা বন্ধু দের হাল-হকিকত জানিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই আমি জেনেছিলাম যে ডা. হেডগেওয়ার তখনও অবিবাহিত, ডাক্তারি অনুশীলনও করেন না; একজন প্রকৃত ব্রহ্মচারী ও কর্মযোগীর মতো নিজের জীবনকে সমর্পণ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গড়ে তোলার কাজে এবং তাঁর এই মহান আত্মত্যাগ তাঁকে একজন সর্বভারতীয় দেশনেতার সম্মান এনে দিয়েছে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে ডা. হেডগেওয়ার, ডা. অ্যানে, ডা. সাভারকর প্রমুখ বীর সাভারকরের সঙ্গে কলকাতায় হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় অধিবেশনে যোগদান করতে আসেন। এবং মহাসভার অধিবেশন স্থলে তাঁরা আমায় দেখা করতে বলেন দূরভাষ মারফত। সেইমতো অধিবেশন প্রাঙ্গণে গিয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করি। তখনও জানতাম না যে ডা. হেডগেওয়ারের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমি ডা. হেডগেওয়ারকে আমার বাড়ি আসার জন্য আমন্ত্রণ করি, তিনিও কথা দেন যে দু'মাস পরে তিনি আমার গৃহে আসবেন। বাংলায় আর এস এসের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তাঁর কলকাতায় আসার পরিকল্পনা ছিল। কলকাতায় হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রাজগির চলে যান। শরীর পুরোপুরি সেরে উঠবার আগেই কর্তব্যের আহ্বানে তাঁকে পুণে যেতে হয়। তিনি মনে করেছিলেন যে পুনায় আর এস এসের কেন্দ্রীয় শিবিরে তাঁর উপস্থিত থাকাটা অনেক বেশি জরুরি। এখানে তিনি প্রায় মাসাধিক কাল শারীরিক দুরবস্থা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করার পরে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় এবং শেষে অসুস্থতায় শয্যা নেন। পার্থিব দেহে এই মহাত্মাকে দেখে ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য আর আমার হয়নি। একটি সদাহাস্যময় মুখাবয়ব, দেশপ্রেমপূর্ণ আত্মা ও বীর-হৃদয় এই জগত থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল। এই প্রয়াণ জাতীয় বিপর্যয়, সমগ্র হিন্দু সমাজের দুর্ভাগ্য।

১৮৮৯ সালে ডা. হেডগেওয়ার নাগপুরে রাজা'র (ভোঁসলে'র) 'কোঠি'র নিকটবর্তী একটি গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর প্রয়াণও হয় এই বাড়িটিতে। তিনি জন্মেছিলেন একটি সু-সংস্কৃতিবান ব্রাহ্মণ পরিবারে, বেদের ভাষ্যের সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত ছিলেন। মাত্র ছ'বছর বয়সে একইদিনে তিনি তাঁর বাবা-মাকে হারিয়েছিলেন। তাঁরা প্লেগের শিকার হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অগ্রজ মাধেও হেডগেওয়ারের কাছে মানুষ হন। মাধেও হেডগেওয়ারও তাঁর বাবা-মায়ের মতো একই ব্যাধিতে প্রয়াত হন। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই। এঁদের মধ্যে একজন এখনও রয়েছেন ও তিনি বৈদিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

হেডগেওয়ার নাগপুরের নীলসিটি হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন ১৯০৭ সাল পর্যন্ত। ওই সময় বিদ্যালয়গুলিতে 'রিস্‌লে সার্কুলার' অনুযায়ী জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তিনি এই বিষয়টি সহ্য করতে পারেননি এবং এজন্য বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তিনি কলকাতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে আসার মনস্থ করেন। এই সময় তিনি লোকনায়ক এম এস অ্যানের অভিভাবকত্বে যবতমালে ওয়াই এস অ্যানের সঙ্গে থাকতেন। পরে তিনি কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রবল দেশপ্রেমিক, দৃঢ়মনস্ক, সাহসী ও কর্মঠ। প্রাত্যহিক জীবনে তিনি অপরের প্রতি দয়াবান ও সহানুভূতিসম্পন্ন। ১৯১১ সালে একদিন যবতমালে তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সিভিল লাইনের নিকটবর্তী লোকালয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন। একজন ইউরোপীয় ডেপুটি কমিশনারের একটি বদভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রত্যেক ভারতীয় যাঁরা তাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে, তাদের থেকে তিনি নতমস্তক নমস্কার (সালাম) আদায় করতেন। সেইসময় ওই ডেপুটি কমিশনার, একজন ইউরোপীয় অসামরিক শল্যবিদ ও পুলিশের এক সার্কেল ইন্সপেক্টর ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হেডগেওয়ারকে তাঁর বন্ধুরা সতর্ক করলেন যে ওই 'সালামাতঙ্কে' (সালামফোবিয়া) ভোগা সাহেবটি আসছে এবং পথ বদলে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ডা. হেডগেওয়ার তাঁর বন্ধুদের এহেন পরামর্শে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না এবং রাস্তার মাঝ বরাবর অলস চরণে পদচারণা করতে লাগলেন। রাস্তার মাঝপথেই ডেপুটি কমিশনার তাঁকে থামালেন, জেরা চলল কোথায় থাকা হয়, নাম কী ইত্যাদি। এবং শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তিনি কি জানেন না যে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কোনও ইউরোপীয়ের সঙ্গে দেখা হলে আনতমস্তকে নমস্কার করে সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়? হেডগেওয়ার জবাব দিলেন, তিনি রাজ্যের রাজধানী শহরের (নাগপুর— অনুবাদক) বাসিন্দা যেখানে এই ধরনের প্রণামের বিষয়টি তাঁর অজানা। আরও বললেন যে, প্রতিটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিকের উচিত এই প্রথাকে ঘৃণা করা। এবং তাঁর কৃষ্টি ও শিক্ষা তাঁকে সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছে, কাউকে নীচু করতে নয়। হেডগেওয়ারের এই সাহসী বক্তব্য ও দৃঢ় সংকল্প ডেপুটি কমিশনারকে হতভম্ব করে দেয়। যদিও সেই অসামরিক শল্যবিদ ও পুলিশের ইন্সপেক্টর এই ঘটনার পরিণতি ভালো হবে না বলে তাঁকে ভয় দেখান ও ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার উপদেশ দেন। কিন্তু এঁদের সতর্কবাণীতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে হেডগেওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করে চলে যান। তিনি লোকমান্য তিলকের যথার্থ শিষ্য ছিলেন। হেডগেওয়ার তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিলকের প্রতিটি পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি 'শক্তি'র প্রকৃত উপাসক ছিলেন এবং এই 'শক্তি'র আরাধানায় তিনি তাঁর বিখ্যাত 'সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। যা ক্রমশ সর্বপ্রধান হিন্দু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে পরিণত হয়েছে, যাঁরা সেনা-প্রশিক্ষণ ও নিয়মানুবর্তীতা শিক্ষা দেন।

ডা. হেডগেওয়ার প্রেরণা লাভ করেছিলেন এই বাংলা থেকেই, বঙ্গভঙ্গের সেই উত্তাল দিনগুলিতে। ১৯২০ সালে লোকমান্য তিলকের প্রয়াণ এবং ওইবছরই নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনের পর

আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কারণে ১৯২১ সালে ডা. হেডগেওয়ারকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯২৫ সাল থেকে তিনি হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দু জাতির ঐক্য ও হিন্দু রাষ্ট্র। এর জন্য তিনি স্বয়ং অক্লেশ পরিশ্রম করেন। পনেরো বছরের এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সঙ্ঘের সাফল্য অসামান্য— বর্তমানে সারা ভারতে তাদের শাখা রয়েছে ৭৫০টি এবং স্বয়ংসেবকের সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার।

১৯০৯ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত যখন তিনি কলকাতায় কানাই ধর লেনে 'শান্তিনিকেতন লজ'-এ বাস করতেন, তখন প্রয়াত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, প্রয়াত বিপিনচন্দ্র পালের মতো অন্যান্য প্রখ্যাত বিপ্লবী-ব্যক্তিত্বরা প্রায়শই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সমসময়ে বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ মুসলমান দেশপ্রেমিক প্রয়াত মৌলবি লিয়াকত হোসেনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল তাঁর। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। দামোদরের ভয়ঙ্কর বন্যার ত্রাণকার্যে ও গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রার সময় তিনি মিশনের স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছেন। তিনি বাংলার যুবকদের সাহচর্য পেয়েছিলেন এবং এই যুবকদের আদর্শবাদে তিনি উদ্বুদ্ধও হয়েছিলেন।

মাত্র একান্ন বছর বয়সে উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে নাগপুরে প্রয়াত হন ডা. হেডগেওয়ার। প্রয়াত হওয়ার ঠিক আগের দিন সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। দাবানলের মতো তাঁর প্রয়াণ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রবল বর্ষণ ও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অবস্থা সত্ত্বেও জনগণের এক বিশাল শোভাযাত্রা তাঁর মরদেহ নিয়ে বিকেল পাঁচটায় শেষকৃত্যের জন্য রওনা দেয়। রেশিমবাগ প্রাঙ্গণে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁর অন্তিমকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর পার্থিব দেহ অগ্নিতে সমর্পিত হলো, দেশবাসীর জন্য তিনি রেখে গেলেন অনুকরণীয় কিছু গৌরবোজ্জ্বল উদাহরণ। যেমন— তাঁর অমূল্য সংগঠন, হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর উপহার— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

হেডগেওয়ারের প্রয়াণে নাগপুরের 'মারাঠা' পত্রিকা 'শোকস্তব্ধ মহারাষ্ট্র' শিরোনামে লিখেছিল—

''আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা ডা. কে বি হেডগেওয়ার গত শুক্রবার ২১ তারিখ নাগপুরে প্রয়াত হয়েছেন। এই দুঃসংবাদটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এর আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থা গুরুতর থাকায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। ডা. হেডগেওয়ারের অন্তিমযাত্রা, নাগপুর এতদিন যা প্রত্যক্ষ করেছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী। প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও তাঁর মরদেহ নিয়ে বিপুল মানুষের যাত্রা শুরু হয় বিকেল পাঁচটা নাগাদ এবং নাগপুরের সমস্ত বিশিষ্ট নাগরিক এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ... বিশেষ অনুমতি নিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় রেশিমবাগ প্রাঙ্গণে। ব্যারিস্টার সাভারকর, ডা. মুঞ্জে, বিধানসভার সদস্য লোকনায়ক অ্যানে, ডা. বরদরাজলু নাইডু, সঞ্জীব কামাথ, শ্রী এ এস ভিদে, ডা. অ্যানে ও অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষেরা ডা. হেডগেওয়ারের আত্মীয়দের কাছে শোকবার্তা পাঠান। সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে জন-শোকসভা আয়োজিত হয়েছে।'

সমগ্র হিন্দু জাতির ভাগ্যে আজ দুর্যোগ ঘনিয়ে এল তাঁর অকাল প্রয়াণে, যিনি সংগঠনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করেছিলেন আর তারই ফলে সৃষ্টি করেছিলেন আর এস এস— ডা. হেডগেওয়ার তাঁর অসমাপ্ত কাজকে ফেলে রেখে বড় তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। শোকের প্রাথমিক আঘাত কাটিয়ে বীর সাভারকর চমৎকৃত হয়ে বলেছিলেন, 'প্রায় এক যুগ আগে হিন্দু মহাসভা হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করেছিল, হিন্দু নেশনও এর সমোচ্চারিত শব্দ যে আদর্শকে আর এস এস গ্রহণ করেছে। হিন্দুস্থান ও হিন্দুত্বের মধ্যে যে সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে ডা. হেডগেওয়ার হিন্দুদের জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু যুব প্রজন্মকে অন্তরঙ্গ বাঁধনে বেঁধে রাখতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ডা. হেডগেওয়ার প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তিনি আমাদের মননে দীর্ঘজীবী হন। আর এস এস দীর্ঘজীবী হোক।'

**প্রসঙ্গ কথা ঃ** রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক পত্র, জগৎজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন 'দ্য মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার মার্চ, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সংখ্যায় (পৃ. ৩৫০-৩৫২) প্রকাশিত হয় এই রচনাটি। রচনার শিরোনাম : 'Dr. K. B. Hedgewar' । রচনাকার ডা. অমূল্যরতন ঘোষ। যদিও মুদ্রণ প্রমাদে অমূল্যরতন, অমূল্যরত্ন-এ পরিণত হয়েছেন। লেখকের দৌহিত্র-জায়া অপর্ণা ঘোষ 'অমূল্যরতন' নামটি সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। লেখাটির সঙ্গে প্রকাশিত হয় দণ্ড-হস্তে আর এস এসের তৎকালীন 'ইউনিফর্ম' বা 'গণবেশ' পরিহিত ডা. হেডগেওয়ারের একমাত্র ছবিটি। রচনার ভাব বজায় রেখে যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা হয়েছে।

এই রচনাটিকে সরাসরি 'শোকনিবন্ধ' (আবিচুয়ারি)-এর গোত্রে পর্যবসিত করতে বাধা রয়েছে। কারণ ডা. হেডগেওয়ারের প্রয়াণের প্রায় একবছর পর রচনাটি প্রকাশিত হয়। তবে এই লেখাটিকে 'স্মৃতিচারণ'-এর পর্যায়ে ফেলতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই। ডা. অমূল্যরতন ঘোষ ছিলেন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ডা. হেডগেওয়ারের সহপাঠী। ১৯০৯ সালের শেষে ডা. হেডগেওয়ার কলকাতায় ৩০১/৩ আপার সার্কুলার রোডস্থ ক্যালকাটা মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটে (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের ওপর এখানে ই এস আই হাসপাতাল হয়েছে) পড়তে আসেন। ১৯১৬ সালের গোড়ায় তিনি নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর এই সওয়া ছ'বছরের কলকাতার ছাত্রজীবন সম্পর্কে জানবার প্রত্যক্ষ সূত্রের অভাব ছিল। ডা. অমূল্যরতন ঘোষের এই রচনাটি এখনও পর্যন্ত অব্যবহৃত, ডা. হেডগেওয়ারের ছাত্রজীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হলে এটি অপরিহার্য আকর সূত্রের কাজ করবে। সেই সঙ্গে ন্যূনতম হদিশ পাওয়া যেতে পারে তাঁর বিপ্লবী জীবনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও।

কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে। নারায়ণ হরি পালকর লিখিত ডা. হেডগেওয়ারের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ 'ডা. হেডগেওয়ার : জীবন চরিত' (প্রকাশ : ১৯৬০ খ্রি., আমরা দেখছি মূল ইংরেজি বইয়ের জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদ, ২০০১ খ্রি., প্রকাশক - ডা. হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি, কলকাতা)-এ তাঁর কলকাতায় ছাত্রজীবনে বাসস্থানের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ডা. মুঞ্জের পরিচয়পত্র

সঙ্গে নিয়ে হেডগেওয়ার ১৯১০ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় আসেন এবং প্রথমে ৭০, বউবাজার স্ট্রিটে 'মহারাষ্ট্র লজ'-এ থাকবার প্রয়াস পান। কিন্তু স্থান অকুলান হওয়ায় কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে তিনি ১৮/২, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের একটি বাড়ির দোতলায় ছ'খানা ঘর ভাড়া করে 'শান্তিনিকেতন' নাম দিয়ে সেখানে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন (পৃ. ৪৬-৪৭)।

এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটির অসারত্বের পরিচয় অমূল্যরতন ঘোষের প্রবন্ধে নিহিত রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, কানাই ধর লেনের 'শান্তিনিকেতন' মেসে ডা. হেডগেওয়ারের ছাত্রজীবন কাটে। সমকালীন কলকাতার পথ-পঞ্জিতে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। পি এম বাকচির ১৯১৫ সালের কলকাতার পথপঞ্জি (দ্র. 'কলিকাতা স্ট্রীট ডাইরেক্টরী, ১৯১৫'; আমরা দেখছি সটীক পুনর্মুদ্রিত সং., পি এম বাকচি, কলকাতা, ২০১৫)-তে কানাইলাল ধর লেনের ২৩/৪ নম্বর বাড়িতে 'শান্তিনিকেতন', মেডিকেল ক্লাবের হদিশ পাওয়া যায় (পৃ. ১২১)। অন্যদিকে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের ১৮/২, নম্বর বাড়ির কোনও উল্লেখই নেই তাতে। আছে ১৮ ও ১৮/১ বাড়ির ঠিকানা। যেখানকার বাসিন্দাদের পরিচয় বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়, মসলার দোকান ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেস। (পৃ. ৩৫৪)

আর এই আপাত নিরীহ তথ্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ডা. হেডগেওয়ারের সঙ্গে বিপ্লবী যোগাযোগের কিছু অপ্রত্যক্ষ পরিচয়। তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান অনুশীলন সমিতির যোগাযোগের কথা সর্বজনবিদিত। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অনেক মারাঠি ছাত্রের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির ওতপ্রোত যোগ ছিল। যেমন মহারাষ্ট্রের সাতারা থেকে ডা. ভি ভি এথলে কলকাতায় পড়তে এসে অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য হন। তিনি তাঁর রাজ্যে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সূচনা করেছিলেন এবং ১৯১০ সালে সাতারা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর কঠিন সাজাও হয়। ডা. হেডগেওয়ারও ভি ভি এথলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। (সূত্র : ইন সার্চ অব ফ্রিডম : যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ফার্মা কে এল এম, কলকাতা, ১৯৫৮ খ্রি., পৃ. ১৬)। তিনিও ডাক্তারি ছাত্রজীবনের গোড়াতেই অনুশীলন সমিতির বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন।

এবিষয়ে বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)-এর সাক্ষ্যটিও সর্বজনশ্রুত : 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আর এস এস) অধিনায়ক শ্রীকেশব হেডগেওয়ার আমাদের অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি যখন ১৯১০ সালে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পড়িতেন, তখন তিনি বীর সাভারকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ দামোদর সাভারকার, ডা. এথলে (সাতারা) এবং আরও কিছু মহারাষ্ট্রদেশীয় যুবক, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আমাদের বিপ্লব দলে যোগ দিয়েছিলেন। 'বাংলায় বিপ্লববাদ' পুস্তকের লেখক শ্রীনলিনীকিশোর গুহ ঐ সময় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন, তিনি তাঁহাদিগকে দলে টানিয়া আনেন। আমার পলাতক অবস্থায় আমি দু-একবার তাঁহাদের ছাত্রাবাসে ছিলাম। ১৯৪০ সালে আমি হঠাৎ তাঁহার নাগপুরের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হই এবং জিজ্ঞাসা করি, 'কালীচরণ দা'র কথা মনে আছে কি?' তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন।' (সূত্র : 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ত্রৈলোকনোথ চক্রবর্তী। অগ্নিযুগ গ্রন্থমালা-৮। প্রথম র‍্যাডিক্যাল সং, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ১৩৬)।

ডা. হেডগেওয়ারের ২৩/৪, কানাই ধর লেনের বাসস্থানের সূত্রেও তাঁর বিপ্লব সংশ্রবকে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজের উপরোক্ত লেখনীসূত্রে আমরা দেখেছি তিনি পলাতক অবস্থায় ডা. হেডগেওয়ারের মেসে দু-একবার আশ্রয় নিয়েছেন। আরও মারাত্মক তথ্য যে, কানাই ধর লেনের তেইশ নম্বর দাগের বাকি তিনটি (২৩/১, ২৩/২ ও ২৩/৩) বাড়িও মেস হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং সেগুলি ছিল বিপ্লবীদের গোপন ডেরা। যেমন সমসময়ে ১৯১০ সালের প্রথম থেকেই বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি থাকতেন ২৩/১, কানাই ধর লেনের মেসের একতলায়। মাসিক ভাড়া ছিল দু-টাকা বারো আনা। খাওয়ার খরচ পৃথক। অনুপস্থিতিতে ভাড়াও কমতো। তাঁর সহাশ্রয়ী ছিলেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের একটি ছাত্র। পুলিশের কাছে খোদ নরেন্দ্রনাথ এহেন বিবৃতি পেশ করেছিলেন। কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ সুপারিনটেনডেন্ট পদে থাকবার সময় তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন, ২৩/২, কানাই ধর লেনের মেসে মুসলমান পাড়ার বোমা মামলায় অভিযুক্ত সত্যেন্দ্র সেনগুপ্ত, অতুল ঘোষ প্রমুখ এই বাড়িতে থাকতেন। (বিষদ আলোচনার জন্য দ্র : 'কলিকাতায় অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা' : তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য, পত্রলেখা, ২০১৫, পৃ. ১২৩-১২৪ ও ২২৪)।

সুতরাং ডা. হেডগেওয়ারের বিপ্লবী যোগাযোগের সূত্র হিসেবেও অমূল্যরতন ঘোষের রচনাটি নতুন আঙ্গিকে বিবেচিত হতে পারে। প্রসঙ্গত, ভারত সরকারের প্রকাশনা বিভাগের (পাবলিকেশন ডিভিশন) 'Builders of Modern India' সিরিজের অন্তর্গত 'ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার' পুস্তিকায় (প্রকাশ : ২০১৫ খ্রি.) লেখক রাকেশ সিন্‌হা ডা. হেডগেওয়ারের বিপ্লবী জীবন নিয়ে অধিকতর আলোকপাত করেছেন (পৃ. ১৫-২০)। কিন্তু অমূল্যরতন ঘোষের রচনাটি তাঁরও অধরা থাকায় এবিষয়ে অনেক তথ্যই অগোচরে থেকে গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রচনাকার ডা. অমূল্যরতন ঘোষ সম্বন্ধেও আমাদের অনুসন্ধিৎসা রয়েছে। তবে সময়াভাবে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সন্ধান করে ওঠা যায়নি। জানা গিয়েছে, হাওড়া জেলার পিলখানায় পৈতৃক বনেদি বাড়িতে তিনি আজীবন বাস করেছেন। হিন্দু মহাসভার সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। ডা. হেডগেওয়ারের হাতে ঘুঁষি মারার গল্পটি বৃদ্ধ বয়সে তিনি নাতি-নাতনিদের কাছে গল্প করে বলতেন। তাঁর দৌহিত্র (অমূল্যরতন ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা ঊষারানির পুত্র) শারীরবিদ্যার কৃতী অধ্যাপক গোপালচন্দ্র ঘোষ তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের কাছে তাঁর দাদামশায়ের এই কীর্তিটি বলতে গর্ব অনুভব করতেন। গোপালবাবু এই মুহূর্তে শয্যাশায়ী, তাঁর স্ত্রী অপর্ণাদেবী আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনুবাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি : *অর্ণব নাগ*

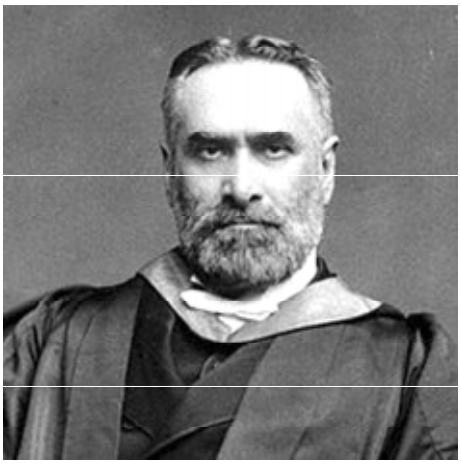

# খোসা ও শাঁস
# হেস্টি-বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম বিতর্ক ও ঐতিহাসিক পত্রযুদ্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস

১৮৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের স্ত্রী, রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের মা, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের পিতামহীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিবরণ মুদ্রিত হয় The Statesman দৈনিকে। রুপোর সিংহাসনে গৃহদেবতা গোপীনাথের উপস্থিতিতে তখনকার কলকাতার বহু গণ্যমান্য নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত ছিলেন চার হাজার অধ্যাপক-পণ্ডিত। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৬.৫.১৮৩১-১০.১.১৯০৮), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৫.২.১৮২৪ -২৬.৭.১৮৯১), কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-১৮৮৪)-এর মতো দিকপাল ব্যক্তি সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার বিবরণ ছাপা হয় ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২— সেখানে ছিল একটু তির্যকতা।

'In the evening some ten to twelve thousand begars received charity in the shape of small coin. On the second day 2,000 Brahmins were feasted; on the third day the kaysts had a feast; while 350 ladies partook of a banquet on the forth day. The fifth and last day, the tenants and domestics were entertained'।

খবরটিতে সামান্য গোলমাল আছে। ২০ সেপ্টেম্বর খবরটিতে প্রথম দুদিনের বিষয় বলার কথা; পরের তিনদিনের খবর এল কীভাবে? ধারণা হয় সাংবাদিক আগাম সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। এমনও হতে পারে, অনুষ্ঠানসূচী পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দেখেছিলেন।

এই সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়াম হেস্টি (১৮৪২-১৯০৩) তীব্র আপত্তি জানিয়ে, কলকাতার প্রগতিশীল নাগরিকদের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন স্ববিরোধী বলে অভিহিত করে সমালোচনা করেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় তাঁর চিঠি প্রকাশিত হয়। পরপর দুইখানি চিঠি লেখেন হেস্টি। এইগুলির তারিখ আর শিরোনাম যথাক্রমে :

১.১. ২৩. ৯. ১৮৮২ : 'The Supposed Necessity of Idolatry'

১.২. ২৬.৯. ১৮৮২ : The Ultimate Philosophy of Brahmanism;'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬.৬.১৮৩৮ - ৮.৪.১৮৯৪) তখন কটক জেলার জাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উইলিয়াম হেস্টি ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র। তিনি স্কটল্যান্ডের তরুণ। স্কটিশ চার্চের প্রতিনিধি হয়ে আসেন কলকাতায়। জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশান-এর প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ১৮৬৮ নাগাদ। ভালো শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তথা নরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৩.১.১৮৬৩-২.৭.১৯০২) শিক্ষক। তাছাড়া আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮)-এর শিক্ষক হিসাবে তাঁর নাম পাওয়া যায়। একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়ানোর অবসরে হেস্টি 'trance' শব্দটি বোঝাবার জন্য নাকি নরেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন, এই মরমি মানসিক স্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতে হলে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (২০.২.১৮৩৫-১৬.৮.১৮৮৬)-এর 'সমাধি'অবস্থা দেখে আসতে পারে। হেস্টির এই চিঠিদুটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রামচন্দ্র ছদ্মনামে লেখেন একটি চিঠি; তা প্রকাশিত হয়।

২.১. : ৬.১০. ১৮৮২ : 'The Modern St. Paul'।

পরদিনই হেস্টি এই চিঠির উত্তর লেখেন। তার আগেই তাঁর আরেকটি চিঠি ওই দৈনিকে প্রকাশ পায়।

১.৩. : ২৯.৯. ১৮৮২ : 'The Ultimate Philosophy of Brahmanism?'।

বঙ্কিমচন্দ্র এই চিঠি দেখে তাঁর উক্ত পত্র (২.১.) লিখেছেন, মনে হয় না। হেস্টি এর জবাবে লেখেন :

১. ৪. : ৭.১০.১৮৮২ : 'The Modern Ram Chandra'। বঙ্কিম লেখেন;

২.২. : ১৬.১০.১৮৮২ : 'European Versions of Hindoo Doctrines'।

হেস্টি এই চিঠি দেখার আগে লিখেছিলেন,

১.৫. : ১৪.১০.১৮৮২ : 'The Challenge Renewed'।

বঙ্কিমের চিঠি পড়ামাত্র হেস্টি আবার একটি পত্র লেখেন :

১.৬. : ১৭.১০.১৮৮২ : 'Ram Chandra Redivivus'।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রাঘাতের উত্তর দিয়েছিলেন;

২.৩. : ২৮.১০. ১৮৮২ : 'Intellectual Supiriority of Europe?'

শেষ চিঠিটি ছিল দীর্ঘ। রামচন্দ্র ছদ্মনামে হেস্টিকে অত্যন্ত সুচারু বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে নৈয়ায়িক যুক্তির স্থাপত্য ধর্ম বিন্যাসে বঙ্গিমচন্দ্র প্রায় ভূমিসাৎ করে ছেড়েছেন। এবার বিতর্কটিতে সমাপ্তি টানার জন্য কলম ধরেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪.৫.১৮১৩-১১.৫.১৮৮৫)। তিনি লিখলেন একটি দীর্ঘ চিঠি। ১৪.১১.১৮৮২ স্টেটসম্যান এই চিঠিটি প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল 'The Recent Controversy'। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, তিনি বর্ষীয়ান শ্রদ্ধাভাজন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিতর্ক আর এগিয়ে নিতে চান না। তাঁর পত্র প্রকাশ পায় :

২.৪. : ২২.১১.১৮৮২ : 'The Recent Controversy'।

হেস্টি রণে ভঙ্গ দিলেন। প্রকাশ করলেন তাঁর ছটি পত্র। সেই পুস্তিকার শিরোনাম ছিল : 'Hindu Idolarty and English Eilighenment : Six Letters address to educated Hindus containing a practical discussion of Hinduism' (1882)। বোঝা যায়, হেস্টি ছিলেন বেশ উন্নাসিক, খ্রিস্টিয়ান ধর্ম-শিষ্ঠ, হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন একান্ত স্ববিরোধী বলে শেষপর্যন্ত বিশ্বাসী। এই মন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বৌদ্ধিক আক্রমণের তীব্রতাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন কিনা বলা কঠিন। তবে তিনি আর চিঠি লেখেননি। ফলে ধরে নিতে বাধা নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে সেই সাম্রাজ্যভুক্ত শিক্ষিত বাঙ্গালির আত্মশ্লাঘা আর শানিত বুদ্ধির জয় হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রগুচ্ছে তাঁর স্বাদেশিকতাকে এক তুঙ্গ উচ্চতায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিধারা উপস্থিত করতে চাই। তার আগে দেখাই, উইলিয়াম হেস্টির পত্রগুলিতে তিনি কী বলছেন।

।। ২।।

প্রথম চিঠিতে হেস্টি তাঁর আশাভঙ্গের কথা লিখেছেন। তাঁর ধারণা ছিল, তখনকার কলকাতা শহরে চিরাচরিত ধর্ম-সংস্কার সম্পর্কে আপত্তি-সমালোচনা-সংস্কারের আন্দোলন যারা করছেন, সেই শিক্ষিত নবচেতনার তরুণদল 'দানসাগর' শ্রাদ্ধের মতো অবান্তর আড়ম্বরের বিরুদ্ধে তাঁরই মতো অর্থহীন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমে পড়বেন। তাঁদের মধ্যে হেস্টির চাহিদা ছিল 'Hope of a higher faith'। তা তিনি পূরণ হতে দেখলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, খ্রিস্টিয়ান সদাপ্রভুর মঙ্গলময়তার প্রতি বিশ্বস্ত। তরুণদের উদ্দেশ্যে তিনি 'with all earnestness and out of the deepest sympathy with their common desire for what is good' — তাতে নজর ফেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর আড়াল উদ্দেশ্য, বলা বাহুল্য, হিন্দু সমাজকে চঞ্চল করা। হেস্টি লিখলেন, হিন্দুধর্ম আসলে অপ্রতিভ, অযোগ্য (ingenious), চতুর (Clever), আর অবজ্ঞাপূর্ণ (seonful)। বলতে হচ্ছে, এখানে তিনটি মাত্রা সন্নিবেশ করেছেন হেস্টি। তাঁর প্রথম বিশেষণ ইউরোপীয় আধিপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। দ্বিতীয়

বিশেষণটি হিন্দুধর্মের শত সহস্র অশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত বিশ্বাসীদের উপর পুরোহিতদের ব্যবহারকে নির্দেশ করতে চাইছে। তৃতীয় ভাবনাটিও তেমনি। অর্থাৎ তিনি নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে হিন্দু সমাজের দুটি বর্গের বিভাজন করতে— মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইছেন। এই তো খ্রিস্টিয়ান মিশনের সাধারণ লক্ষণ।

সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে চার হাজার ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র তাঁর কাছে 'noisy passages of ancient rhetoric' আর তার দ্বারা কুসংস্কারকে সমর্থন করা ছাড়া অন্য কিছু হয়নি। এ ছিল নিছক 'practical evils of the popular superstition'। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখছেন, শিক্ষিত, তথাকথিত যুক্তিবাদী দেশীয় বিদ্বজ্জন এই পৌত্তলিকতার সমর্থনে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া (phychological justification) খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

একদা তিনি রাধাকান্ত দেব বাহাদুর (১৭৯৩-১৮৬৭)-এর সঙ্গে পৌত্তলিকতা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। রাধাকান্ত দেব তাঁকে বলেছিলেন, পাশ্চাত্য সমাজ যে যুক্তিতে শিশুদের হাতে পুতুল খেলতে দেয়, ভারতীয়রা ধর্মক্ষেত্রে যখন মানসিক বা তাত্ত্বিকভাবে অবিকশিত থাকে তখনই মূর্তিপূজা করে। হিন্দু দর্শনের গভীরে প্রবেশ করলে এই সাকার পূজার প্রয়োজন আর থাকে না। এই কথা মনে করে হেস্টি বলেছেন, শিবালয়গুলিতে কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মনের মানুষ (delicate mind) বিচিত্র বীভৎস কম্পন (shudder) ছাড়া কিছু পাবে বলে মনে হয় না। কালীকে তাঁর মনে হয়েছে ভয়ঙ্করী রক্তলোলুপ (the horrid and bloody Kali)। গণেশ তো elephant headed huge-panuched Gajapati- ছাড়া কিছু নয়। এই জনপ্রিয় হিন্দুধর্মে (popular Hinduism)-এর মধ্যে পবিত্র নৈতিকতা (moral pureness) দেখতে পাননি।

এসব থেকে কলকাতাবাসীদের উদ্দেশ্যে তার কথা— এসবই পৌত্তলিকতা ছাড়া কিছু নয়। 'Ye men of Calcutta, I perceive that is all things ye are to superstitions'। তার প্রশ্ন তোমরা পূজাভক্তি করো অজানা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। ('to the unknown god whom therefe ye ignorantly worship)।

হেস্টির ধারণা ছিল বেদ আদিতে প্রকৃতি পূজা ('Nature worship) হলেও ক্রমে পশুবলি আর বহুদেবতাবাদ (my riothestic idolatry)-এ পরিণত হয়েছে। এর ফলে ভারতে অবনতি হয়েছে চূড়ান্ত (all the demoralisation and degradation of India')। তিনি মনে করে 'only Christianity' এই অবস্থার বদল ঘটাতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি পড়ে তীব্রতা বৃদ্ধি পায় হেস্টির। তিনি বঙ্কিমের ছদ্ম নামটিকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। তাঁর ভাষা 'modern Brahman, Ramchandra Redivivus' এই আধুনিক ব্রাহ্মণ আসলে রামচন্দ্রের অবতার ছাড়া আর কিছু নয়। বেদান্ত আর হিন্দুত্বকে তিনি ভিন্ন ধারার ধর্মবিশ্বাস বলে মনে করেন। শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূক্ত (এই গ্রন্থটির নাম হেস্টি ভুল জানতেন, এটি হবে 'ভক্তিসূত্র'! বঙ্কিম তাঁর চিঠিতে এই ভুল সংশোধন করে দেন) হেস্টির মতে 'pearl of Sanskrit literature'। তাঁর আরও দাবি, সংস্কৃতচর্চা ইউরোপ-আমেরিকায় যতটা হয়, ভারতে তার কণামাত্র হয় না। আসলে ভারত সেই সংস্কৃতি থেকে অধঃপতিত ভ্রষ্ট। 'native Pundits, like Ramchandra are quite helpless against the logical inferenss deducible from this knowledge of them'। বঙ্কিমচন্দ্র এই অহঙ্কৃত মতামত, অন্ধত্ব আর ভারতীয়দের তদানীন্তন জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি সম্পূর্ণ অজ্ঞ হেস্টির বিপক্ষে কলম ধরেছিলেন। তাঁর চিঠি ক'টি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শুধু বঙ্কিম জীবনেই বা বলি কেন, নতুন ভারতের মূর্তি তাঁর কলমে সেদিন অপূর্ব উজ্জ্বল হয়েছে— প্রাচীন ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক রচনা করার ক্ষেত্রে এই অভাবিতপূর্ব বিচক্ষণতার তুলনা নেই। এই প্রবন্ধের পরের অংশে সেকথা উপস্থিত করছি

।। ৩।।

নিপুণ নৈয়ায়িকের মতো বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে উইলিয়াম হেস্টির দুর্বলতাকে নির্দিষ্ট করে তাঁকে এবিষয়ে আলোচনার অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। প্রথমদিকে রামচন্দ্র ছদ্মনামে বঙ্কিম যে তিরগুলি ছুঁড়েছেন তাতে ব্যঙ্গের কশাঘাত আর তাঁর অপ্রস্তুতির দিকগুলি আহত হয়েছে। সামান্য পরেই হেস্টি বুঝেছেন, তিনি এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুশলী ধানুকির সামনে পড়েছেন। 'লোকরহস্য' পড়া থাকলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনটি বোঝা সম্ভব। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী এইসব পশ্চিমা শিক্ষিতরা যা ভাবেন, তাতে আত্মস্ফীতি আছে, তাদের ধারণা ইউরোপ যা জানে তাই শ্রেষ্ঠ, যা মানে তাই জ্ঞান। বঙ্কিমচন্দ্র হেস্টিকে তাই লিখলেন, তিনি হিন্দু ধর্মাচার সম্পর্কে ভালো মতো প্রস্তুত হলে ভালো করতেন, 'it is fit that he should render himself better aquainted with the doctrines of the Hindoo religion'। হিন্দুধর্মকে না জেনেই তার সৌধ ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা বঙ্কিমের অপছন্দ।

বেদান্ত আর হিন্দুধর্ম এক নয়। ভাগবতগীতা, ভক্তিসূত্র ইত্যাদি ইউরোপীয়দের কাছে পড়ে উনি হিন্দুধর্ম বুঝতে চেয়েছেন। এ একেবারেই হাস্যকর। কারণ ইউরোপীয়রা নিজেরাই এসব বিষয়ে কিছু জানেন না। 'they cannot teach what they do not

understand'। এরপর বঙ্কিমের তীব্র কশাঘাত — 'The blind cannot lead the blind' (২:১), বঙ্কিমচন্দ্র হেস্টিকে একথাও বললেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর শিক্ষালয়ের দুর্বল ছাত্র বলে ভাবলে ভুল করবেন, তিনি তাঁর 'unpromising students in the general Assemblys Institution' বলে ভাবছেন— এমন হচ্ছে না তো!

বিতর্কের এই পর্যায়ে বঙ্কিম তাঁর আস্তিনের আসল রুমালগুলি বের করেননি। দেশীয় সমাজ সম্পর্কে আত্মমর্যাদা বোধ স্টেটসম্যানের পাঠকদের কাছে উত্থাপন করতে চেয়েছেন তিনি। হেস্টি এই চিঠি লিখে ভারতের মানুষকে অপমান করেছেন। এ একান্তই অহেতুক, অসহিষ্ণু, অন্যায়, অবাঞ্ছিত আক্রমণ। বঙ্কিমের ভাষা :

'Mr. Hastie attacks, without any provocation, the proceedings in a solemn mourning ceremony held in the private dwelling-house of all the most respectable Hindu families in the country, attacks all the most respected members of native society; attacks their religion; attacks the religion of the nation' (২:২)। ধর্ম-জাতি সম্পর্কে এই গৌরববোধ বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মমর্যাদাবোধ বলে মনে করি। তিনি হেস্টির চেষ্টাকে উপেক্ষা করছেন, কারণ তাঁর মতে, 'Hinduism has nothing to fear from his labours'- হেস্টির আক্রমণে হিন্দু ধর্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।

এরপর ধীরে ধীরে বঙ্কিম ঢুকছেন তাঁর যুক্তিজাল ছড়িয়ে— নিজের সীমায় এনে ফেলছেন হেস্টিকে। তাঁর মতে, ভারতীয় সংস্কৃত পাশ্চাত্য ভাষায় যথাযথ অনুবাদ অসম্ভব। অনুবাদ করতে হলে ভারতের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে যথাযথ জানতে হয়। সেই অনুশীলন শ্রদ্ধা যোগ্যতা ইংরেজ-জার্মান পণ্ডিতদের নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র ভাষা ভারতীয় ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি 'Tentonic brain'-এ ঢুকবে না। এর কারণ প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য মন পৃথক, ইংরেজ-জার্মানদের জ্ঞানকাণ্ডও 'utterly foreign to the Hindu' (২:২; হিন্দু বানান আগের পত্রে ছিল Hindoo)। বঙ্কিমচন্দ্র সোজাসাপটা নিজের কথা জানিয়েছেন : তাঁর আত্মবিশ্বাসী ভাষা আমাদের বিস্মিত করে। বুদ্ধিজীবীতার এমন উচ্চারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর অগ্রসর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে বঙ্কিম লিখেছেন : 'These which form the spirit and the matter of religious and philosophical treatises, are entirely distorted, ...mis represented in every translation - even in the best' (২:২)।

তাহলে বিদেশিরা কি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু পড়বেন না, জানতে চাইবেন না? বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, যদি সত্যি জানার আগ্রহ থাকে, তাহলে ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে আসতে হবে। যাঁদের স্বধর্মনিষ্ঠা আছে, তারাই এব্যাপারে যথার্থ শিক্ষকতা করতে পারবেন। অন্যথায় যে কোনও অর্ধমনস্ক চেষ্টাই থাকবে অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর। বঙ্কিমের মতে 'without a loving and reverential study' ভারত-সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ অসম্ভব। বঙ্কিম লিখেছেন, 'I say it most emphatically --- as every other European who has made the attempt has failed' (২:২) হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে ঠিকমতো না জেনেই হেস্টি সাহেব 'without a correct knowledge of its doctrine' যে চেষ্টা করেছেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু বক্তৃতা দিয়ে হিন্দুধর্মের সুপ্রাচীন ধারাবাহিকতা 'the oldest and the most enduring of all religions systems' -কে ধ্বংস করা (to demolish) একান্ত অসম্ভব। কিছু ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধা করেননি। এঁদের মধ্যে তাঁর বলা ব্যক্তিদের নাম লিখছি :

১. ফ্রেডরিক ম্যাক্সিমিলান মুলার (১৮২৩-১৯০০) অর্থাৎ ম্যাক্সমুলার।

২. থিওডর গোল্ড স্টিকার (১৮২১-১৮৭২)।

৩. হেনরি টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭)।

৪. অ্যালব্রেক ফ্রিডারিক ভন ও ফেরার (১৮২৫-১৯০১)।

৫. রুডলফ ভন রোথ (১৮২১-১৮৯৫)।

৬. জহন মুইর (১৮১০-১৮৮২)।

বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ের প্রকৃত ভারততত্ত্ববিদদের কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলন, শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বঙ্কিম লিখেছেন, যদি পড়তেই হয়, এঁদের মারফৎ সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পড়ে, উইলিয়াম হেস্টি নিজেকে প্রস্তুত করুন। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা ড. কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ইংরেজিতে লেখা ভারততত্ত্ব সম্পর্কে প্রকাশিত রচনার উপরও নির্ভর করতে পারেন হেস্টি। তা না করে হেস্টির চেষ্টা বঙ্কিমের মতে অপ্রস্তুত আস্ফালন।

হেস্টি যে কতটা অপ্রস্তুত তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন বঙ্কিম। তাঁর প্রথম চিঠিতে (২:১) সূত্র স্থলে 'suka' ছাপা হয়। হেস্টি তাঁর চিঠিতে শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূক্তকে 'among the pearls of Sanskrit Literature' -এর মধ্যে একটি বলে চিহ্নিত করেন। সে চিঠিতে তিনি সংশোধন করেন এটি। তাঁর ধারণা ছিল, 'সূক্ত'স্থলে 'suka' ছাপা হয়েছে। এনিয়ে বঙ্কিম তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে তীব্র ব্যঙ্গ করেন হেস্টিকে (২:২)। এই তো তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের মণিমাণিক্য সন্ধান!

তৃতীয় পত্রেও বঙ্কিম হেস্টির কথাকে লঘু ভাবে অস্বীকার করে বলেছেন, ব্রাহ্মণ যখন পেশাদার তখন তাদের কাছে বিশেষ কিছু গভীরতা আশা করা যায় না। 'a Brahman's proper occupation during the Puja is feasting, not controversy' (২:৩)— তারা তর্ক করেন না। আসলে বঙ্কিমকে হেস্টি চাল কলাভোজী বামুন ভেবেছিলেন। 'Modern Ramchandra' কোন ধাতুতে গড়া তা বুঝতে বাকি ছিল তাঁর। ক্রমে সেই গভীর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উপলব্ধি উচ্চারিত হল— হিন্দুধর্মের নতুন ভাষ্য রচনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

।। ৪ ।।

বঙ্কিমচন্দ্র সৃজনশীল সাহিত্যিক। তাঁর উপমা রূপক ভাষ্য অব্যর্থ। তৃতীয় পত্রে তিনি একটি প্রচলিত লোককথা উত্থাপন করেছেন। এক ক্ষুধার্ত নাবিক এক দেশীয় মানুষের কাছে নারকেল উপহার পেয়ে মুশকিলে পড়ে। 'The hungry sailor who had never seen a coconut before'। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, উইলিয়াম হেস্টিও আসলে ওই নাবিকের মতো ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ। উনি জানেন না, ছোবড়া ভেদ করে শাঁসে প্রবেশের উপায়। পাশ্চাত্যের বহু বিশেষজ্ঞই অনুরূপ, তারা জানেন না বিশেষ কিছু, নিজেদের অতিরিক্ত বুদ্ধিমান ভাবেন, ফলে এই তথাকথিত 'intellectual superiority' না দেখিয়ে উইলিয়াম হেস্টির উচিত ছিল দেশীয় কোনও বিশ্বাসী জ্ঞানীর সাহায্য নেওয়া। এইরকম 'native guidance' ছাড়া তিনি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবেন না।

ভারতের জ্ঞান শ্রবণ-কথনের উপর নির্ভরশীল এই মৌখিক পরম্পরা বাইরে থেকে অনুভব, উপলব্ধি করা অসম্ভব। এই 'bulky literature which has to be handed down from teacher to pupil by word of mouth' হেস্টি জানবেন কিভাবে? প্রকৃতপক্ষে গুরু-শিষ্য পরম্পরাবাহিত 'vast mass of traditionary and unwritten knowledge in India' জানার একমাত্র উপায় এদেশের মৌখিক পরম্পরা-বাহিত শিক্ষাদানের কৌশল 'oral instruction' যা আসলে 'systematised into an art' (২:৩)। আমাদের দেশীয় জ্ঞানকাণ্ডের একটি প্রধান অংশই 'শ্রুতি'। একে লিপিবিদ্যার মাধ্যমে জানার ধৃষ্টতা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বঙ্কিমের পরামর্শ তখন পর্যন্ত দেশে টোলের ভট্টাচার্যরা এই শ্রুতি সংস্কৃতি অল্প হলেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁদের কাছে কিছু হলেও ভারতের অতীতকালের ধারাবাহিকতার কিছুটা পাওয়া যেতে পারে। একথা ঠিক, এদেশে মুসলমান শাসনের পর প্রাচীন জ্ঞান অনেকাংশে লুপ্ত হয়েছে। এর অন্য কারণও ছিল।

বঙ্কিম তাঁর তৃতীয় পত্রে লিখেছেন, এদেশের পণ্ডিতবর্গ পারস্পরিক দ্বেষ-ঈর্ষা-দলাদলির কারণে এই প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 'India has uutterly lost so many of her ancient arts, and so much of her ancient science'। এখন ভারতীয় জ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় শুকনো হাড়, কঙ্কাল মাত্র। এতে রক্ত মাংস প্রাণ সঞ্চার করা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পক্ষে অসম্ভব। যদিও 'the breathing form of the old hearing and the old civilisation is visible to native eyes only'। একে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ভারতবিদ্যা (Indology), প্রাচ্যতত্ত্ব (Orientalism) যা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) প্রভৃতি জ্ঞানচর্চা করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে শুকনো হাড়ের ঠোকাঠুকি বলতে চান। যারা প্রাচীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, হিন্দুধর্মে আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন, সেই দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যেই ভারতের আদি ও অকৃত্রিম জীবন্ত রূপটি ধরা পড়বে বলে বঙ্কিম জোর দিয়ে উত্থাপন

করেছেন।

বৈদিক সাহিত্য ও জ্ঞানরাশি ভারতেও হারিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে রঘুনাথ শিরোমণি (১৪৭২— ১৬শ শতকের মধ্যভাগ), গদাধর, জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৬শ-১৭শ শতক) প্রভৃতি পণ্ডিতদের টোলে বাংলার মনীষার পরিচয় ('the pride and glory of the Bengali race') পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া রামানুজ (১১শ শতক)[১], জীব গোস্বামী (১৪৩৩-১৫২৮)[২] প্রমুখ ভাগবতপুরাণের যে দার্শনিক ও অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছেন ওইসব না জেনে কিসের অহঙ্কার করছেন হেস্টি? তন্ত্রের কথা সামান্য উল্লেখ করে এর কদর্য দিকটি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন হেস্টি। বঙ্কিম লিখলেন তন্ত্র বিষয়ে 'the European knows next to nothing'। আর ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে তার জ্ঞান হয়তো চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪০-১৯২৪)-র 'শকুন্তলা তত্ত্ব' এক ঘণ্টা মাত্র পড়ার ফল। এমনভাবে মহাকবি কালিদাস সাহিত্যের মর্ম বোঝা অসম্ভব।


*With Best Compliments*

*from-*

**S. S. FORGINGS**

G. T. Road,
Bye-Pass,
Near Ptk. Chowk
Jalandhar - 144 012
(Punjab) India
Off. : 0181-2601976,
2601719
Fax : 0181-2601719


এমনকী কালিদাস বোঝার জন্য তিনি কবি জোহান উল্‌ফগাঙ ভন গ্যেটে (Johann Welfgang von Goethe-১৭৪৯-১৮৩২) -এর ভাষ্যাদির সঙ্গেও পরিচিত হননি।

হিন্দু সমাজের ব্যবহার বিধি, দিনানুদৈনিক সম্পর্কে জানার অধিকার স্মৃতি-শাস্ত্রাদির পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব-তল্লাশ ছাড়া জানা যায় না। হেস্টি তা করেননি। যথারীতি বঙ্কিম হেস্টিকে অপ্রস্তুত বলে উপেক্ষা করেছেন। তাঁর ভাষা 'he did not possess the necessary qualifications'। এইভাবে যথাসম্ভব তির্যকভাবে সমালোচনা করার পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুক্তি সাজিয়েছেন। গড়ে তুলেছেন হিন্দুধর্মের নবভাষ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই মহা পরিবর্তনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের এই নবভাষ্য হিন্দুধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যান উপস্থাপন করলেন। সংস্কৃত ভাষায় অনধিকারী, ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে বিশ্ব দর্শনের প্রবণতায় একটি প্রজন্ম তখন বাংলায় উৎকেন্দ্রিকতার চূড়ান্ত করছে। হেস্টিকে উপলক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র এই ইংরেজি নবীশ বাঙ্গালি যুবকদেরও ঘরে ফেরার ডাক দিচ্ছেন বলে মনে করি। স্টেটসম্যান পত্রিকায় তিনি যে চিঠিগুলি লিখলেন তার মধ্যে এই দুধারি তরবারির কুশলী ব্যবহার আমাদের তেমনি এক সিদ্ধান্তের দিকে নির্দেশ করছে।

হিন্দুধর্ম বুঝতে হবে হিন্দুর দৃষ্টিতে। বঙ্কিমের মুখ্য প্রতিপাদ্য ছিল তাই— 'Hinduism from the Hindus point of veiw' দেখতে হলে, বঙ্কিম লিখেছেন— তার তিনটি স্তরকে জানতে হবে। বস্তুত এখান থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর ঋষিত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ধর্মবেত্তা এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টি সে যুগের পক্ষেও ছিল বিরল। বঙ্কিম উল্লেখিত এই তিন স্তর হল—

১. হিন্দু ধর্ম হলো একটি জীবনবোধ - 'a doctrinal basis or the creed'। এই জীবনবোধ বা জীবনচর্যাটি না বুঝলে চলবে না।

২. দ্বিতীয়ত, হিন্দু ধর্ম পূজা বা আচার (wordhip or rites)। দিকে দিকে দেশে দেশে ছড়ানো এই পূজাচারে সঙ্গতি বিধান অসম্ভব। বিশেষ করে যদি কেউ নিছক তথ্যসন্ধানী হয় এর মর্ম বোঝা অসম্ভব। এর পিছনে যে বিনয় ও আত্মনিবেদন আছে তা উপলব্ধির বিষয়।

৩. শেষপর্যন্ত হিন্দু ধর্ম হলো এক ধরনের নৈতিকতা, নিষ্ঠা আর সংযম। বঙ্কিমের ভাষা— 'a code of morals more or less dependent upon the doctrinal basis'।

এই ত্রিমাত্রিক হিন্দুধর্মকে না বুঝে হিন্দু ধর্ম সমালোচনা দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ হতে বাধ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত জীবনবোধ বা জীবনচর্যার দুটি ভেদ করেছেন। ক) একে বলা যায় বিশ্বাস বা নির্ভরতা— 'dogmas'। তবে তার পিছনে আছে দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যান। এইসব 'dogmas

formulated, explained and illustrated in a mass of philosophical literature'।

খ) আর আছে বিভিন্ন লোককথা, জনশ্রুতি— 'legends' এবং 'Purans'।

বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, এসবই অর্বাচীন কালের। আধুনিক সময়ের হিন্দু জীবনবোধ ও চর্যা 'modern Hinduism'-এর ভিত্তি বেদ-উত্তর পর্বে বিকশিত; এসবই 'post-Vedic'। ক্রমে তা দর্শন, সংস্কার (dogma) সমূহের ভিত্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এর একটি মৌল কাঠামো গড়ে উঠেছে সাংখ্য দর্শনের উপর ভিত্তি করে। কপিল মুনির নামে চলা এই সাংখ্য দর্শনকে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক হিন্দু ধর্মের ভিত্তি বলে ধরতে চান।

সাংখ্য মতে বিশ্বব্যাপার পুরুষ-প্রকৃতি সত্তার যুগপৎ যুগবদ্ধ একাত্ম প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের উপযোগী করে একে ব্যাখ্যা করেছেন, হেস্টির বিভ্রান্তি দূর করার সঙ্গে সঙ্গে সেও তাঁর চিরস্থায়ী কীর্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির মাধ্যমেই এদেশের প্রধান দেবদেবীর মূর্তি গড়ে উঠেছে। যেমন,

প্রকৃতি : অর্থাৎ 'Nature', 'simply the Manifestations of force'। এই 'force' হলো শক্তি। শক্তি যখন ধ্বংসাত্মক, 'destructive' তখন তা 'কালী'তে রূপান্তরিত, কল্পিত পূজিত। আর যখন তা 'constructive' তখন তা 'দুর্গা' রূপে কল্পিত হয়।

পুরুষ : বঙ্কিম একে বলেন 'The universal soul' একে তিনি 'ব্রহ্ম'স্বরূপ ভেবেছেন। এর গুণ ও রূপ বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে দেখতে চান।

| গুণ | ক্রিয়া | কর্ম | রূপ |
|---|---|---|---|
| 'goodness' | 'Love' | 'creats' | ব্রহ্মা |
| 'passion' | 'power' | 'preserves' | বিষ্ণু |
| 'darkness' | 'justice' | 'dooms; | শিব |

এই গুণ শব্দ আমাদের। বঙ্কিম লিখেছেন 'English translation'; আর ক্রিয়াকে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর ভাষা 'I translate'। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণের মৌলিকতা সুস্পষ্ট হয়।

সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষের দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র রাধাকৃষ্ণ কথায় ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষা 'The great duality - Nature and soul presies over all. Krishna is soul Radha is Nature'— প্রকৃতি পুরুষ রূপী রাধা-কৃষ্ণের এই আশ্চর্য বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু ধর্ম-দর্শনের নব ব্যাখ্যান বলে মনে করি। এ প্রসঙ্গে লিখিত উইলিয়াম হেস্টি রাধা-কৃষ্ণ কেন্দ্রিক বৈবত ও ধর্মাচারকে মনোরঞ্জক উপাদানে সমৃদ্ধ বলে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, এই রূপক 'child like simplicity' আর সেখানে নৈতিকতার উপস্থিতি নেই— 'moral pureness' না থাকায় তাকে তিনি অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন (১:১)। বঙ্কিম স্বীকার করেছেন, 'The legend of Radha and Krishna retains the illegitimate coneection' (২:৩) তা সত্ত্বেও এই কল্পকথা জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তা অবৈধ অনৈতিক প্রণয়কথাকে এক তুঙ্গ শিল্পকলায় সত্য ও প্রেম আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করেছে। ফলে বঙ্কিম রাধা-কৃষ্ণ প্রণয় মহিমার ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে 'this union of the soul with Nature lies the source of all beauty all truth, and all love'। তাঁর ব্যাখ্যা হিন্দু জানে 'love for all that exists'। পাশ্চাত্য আলোচকরা রাধা-কৃষ্ণকথায় দেখেছে বিদ্রোহ, অনৈতিকতা, অপরাধ। এই হলো প্রেমহীন সৌন্দর্যবোধহীন পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের সীমা। এছাড়া তারা কিই বা ভাববেন! একে বঙ্কিম বলেছেন, 'invented by the brain of man. So much for the intellectual superiority of Europe' (২:৩) তাদের পক্ষে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরীয় লীলা বোঝা অসম্ভব।

'কুমার সম্ভব'— বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই লীলারই অন্য রূপ। এ হচ্ছে পবিত্র বিবাহের মহাকাব্যিক রসঘন অভিব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা 'কুমারসম্ভব' 'least understood both in India and Europe'। সাহিত্য, প্রাকৃত নরনারীর সম্পর্ক, যৌনতার শিল্প রূপ হিসাবে ভাবার পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটিকে সাংখ্য দর্শনের রূপান্তরিত রূপকল্প হিসাবে ভাবতে চেয়েছেন। এই সাহিত্যখণ্ড আসলে 'celebrates the marriage of Nature with soul, typified in Uma and Siva' (২:৩)। ভারতে দর্শন, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান আর লোককৃত্য তথাকথিত সর্বদজনীন সাহিত্যের সঙ্গে এইভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। একে বোঝার জন্য এই দেশের মানুষের কাছে জ্ঞানলাভের জন্য সবিনয় নিবেদন করতেই হবে।

।। ৫ ।।

উইলিয়াম হেস্টির আসল আক্রমণাত্মক সমালোচনা এদেশের মানুষদের পৌত্তলিকতার বিকৃতি। হেস্টি লিখেছিলেন, ঈশ্বর কেন মন্দিরে থাকবেন, তিনি তো 'dwelleth not in temples' (১:১)। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, হিন্দুদের পূজাচারের অনর্থকতা এর পুরোহিতরাও জানে। 'Hindu rituals is mere murmmery (২:৩)। বিশ্বাসী হিন্দুরা সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। তাঁর স্পষ্ট কথা— আহ্নিক কখনোই পৌত্তলিকতা নয়। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা কখনো কখনো বিষ্ণু বা শিব পূজা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে মন্ত্র ধ্যানই প্রধান— 'he is not bound to worship their image'।

হেস্টি তাঁর চিঠিতে রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কথা লিখেছিলেন, রাধাকান্ত নাকি তাঁকে বলেছিলেন মূর্তি পূজা আসলে শিশুদের পুতুল খেলা ছাড়া অন্য কিছু নয়। হেস্টি হিন্দুর ধর্মাচারে কোথাও এর প্রমাণ পাননি 'childlike simplicity' অপেক্ষা কুযুক্তিপূর্ণ চাতুর্য বলেই মনে করেন। বঙ্কিম বিষয়টি মানুষের উচ্চ কবিত্বশক্তি, কল্পনা আর শিল্পশোভন আবেগের সঙ্গে বিবেচনা করতে চান। তাঁর ভাষায় এ হল : 'The passionate Ideal in beauty, in power and in purity, must find the expression in the world of the Real'। এইভাবে সুন্দর, সত্য, শক্তি, শুদ্ধতার আদর্শ বস্তুবিশ্ব থেকে ভাবকল্প হয়ে ওঠা তো বিশ্বজনীন! একে বঙ্কিম 'passionate yearning' বলে গণ্য করতে চান। তাঁর আরও যুক্তি হ্যামলেটের গভীর বেদনার্ত মূর্তি কিংবা প্রমেথিউসের বিদ্রোহ আর ব্যর্থতাও তো তাই। 'The existence of idols is an justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus'। সুতরাং হিন্দুই কেন শুধু পৌত্তলিক বলে নিন্দিত হবে?

মূর্তি আর প্রতিমা এক নয়। হিন্দু প্রতিমাপূজক কিন্তু মূর্তিপূজক নয়। মূর্তি বাজারে বিক্রি হয়। যারা গড়ে তারাও নিষ্ঠার সঙ্গে পবিত্রতা বজায় রেখে মূর্তি নির্মাণ করে। বঙ্কিম বলেছেন এসবই 'made by impure workman sold in bazars'। মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তার আগে তা পূজার যোগ্য থাকে না। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর তা প্রতিমায় উন্নীত হয়। হয়ে ওঠে 'God's image'। এই কল্পনা বিশ্বাস শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আমাদের সমাজের সাংস্কৃতিক শক্তি— এ হচ্ছে 'for the sake of culture and discipline' প্রতিমাপূজার ঐ প্রেক্ষাপটটি না জেনেই হেস্টি আক্রমণাত্মক হয়েছেন। অন্য পক্ষে দর্পণ বিসর্জনের পর প্রতিমায় আর দৈবী সত্তা থাকে না। তখন তা যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া হয়।

অন্যপক্ষে মন্দিরের দেওয়ালে মূর্তি গঠিত হয়েছে, এসব প্রস্তরমূর্তি ভাস্করদের নির্মাণ, এই 'sculplor'-দের নন্দিত উপস্থাপনা 'is a question of art only'। আরেকটি কথা বাঙালিই মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে পূজা করে। এর কারণ, মুসলমান আক্রমণ। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এ প্রদেশে 'the few good images we have been mutlated or destroyed by the hand of Mussalman Vandals' (২:৩)। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এজন্যই বাংলায় সাময়িকভাবে মূর্তি গড়ে পূজা বিসর্জনের রীতি গড়ে উঠেছে। পুতুল ও প্রতিমার এই সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা, এই মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটটি না জানলে হিন্দু ধর্মের ভুল ব্যাখ্যান অনিবার্য।

।। ৬।।

স্মৃতি শাস্ত্র হিন্দুর জীবনে ব্যবহারিক বিধি ও বিধান। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন এই নীতি বা ethics-এর দুটি মাত্রা। ১. ব্যক্তিগত আর ২. সামাজিক। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'It is a system of ethics as well as a polity'। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর ফল অত্যন্ত গভীর। একে 'code of personal morality' বলা যায়। এই মূল্যবোধ ভারতীয়কে সৎ সংযমী বিনয়ী করেছে। ভারতীয় মনের গড়নে যে মধ্যপন্থা আছে তার উৎসে এই বিধিবিধানের প্রভাব বিদ্যমান। পাশ্চাত্যের অভিঘাতে এর মূল বৈশিষ্ট্যটি আজও অনেকখানি থেকে গেছে। একে খ্রিস্টিয় উপাদান বলে ধারণা করেছিলেন কেউ কেউ, বিশেষত হেস্টি। এটি অসার বলে প্রতিপন্ন করেন বঙ্কিম।

সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু স্মৃতি শাস্ত্রের প্রভাব কিছুটা ভালো মন্দে মেশানো। রাজ্য পরিচালনা তথা রাজনীতির ক্ষেত্রে (বঙ্কিম যাকে বলছেন ('polity') এর প্রভাব ইতিবাচক। 'The Social polity is even more wonderful'। আমাদের দেশে রাজশক্তি সম্পূর্ণভাবে নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। এই নীতিনিষ্ঠ শক্তি ('Moral power') ছিল বলেই তা অত্যাচারী লোভী আক্রমণাত্মক হিংস্র হয়নি। নৈতিক বিধি বিধান রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন 'It is the only system which has abolished war and the military power'।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ খুঁজেছে আদর্শ রাজনীতির ভূমিকা। বেনথাম, কঁৎ ও মিল-এর চিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র— পাশ্চাত্যের হিতবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, তাঁদের অভিমত উল্লেখ করা যায়। জেরিমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) ছিলেন রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের সুখ বিধানের লক্ষ্যে পরিচালিত আইন ও নৈতিকতার সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী। অগুস্ত কুঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) ছিলেন কল্প-সমাজতন্ত্রী '(Utopean socialism)। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গড়েন 'দৃষ্টিবাদী সমিতি'। এই সংগঠনই হিতবাদী দর্শনের প্রধান প্রচারক। সমাজ বিবর্তন ক্রমে অতীতের কাল্পনিক দৈব ধারণা থেকে অধিবিদ্যা বা metaphysical ধ্যানধারণাকে অবলম্বন করেছে। আধুনিক যুগে অধিকতম মানুষের অধিকতম সুখের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক ধানধারণার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করতেন তাঁরা। জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ছিলেন সমাজ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী। তাঁর 'Essays on Liberty' (১৮৫৯)-র প্রবন্ধগুলির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। এই প্রবন্ধমালার মধ্যে নারীর অধিকার বিষয়ক ভাবনা[৪] বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করে। তিনি

জনপ্রতিনিধিত্ব সম্পর্কেও ভেবেছেন। এবিষয়ে তাঁর 'Consideration of Representative Goverment' বেশ স্মরণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র উইলিয়াম হেস্টিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, এইসব স্মৃতিশাস্ত্র অনুধাবন করলে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মঙ্গল বিধানের শক্তি সম্পর্কে ধারণা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা যা ভেবেছেন, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র তা হাজার বছর আগেই বিধিবদ্ধ করেছে। ভারতবর্ষই তাদের স্বপ্নের রাজনীতি বা 'Dream of a positive polity'-র উৎস বিন্দু। হিন্দুধর্মই তাদের বুদ্ধিজীবীতার সুচনায় 'intellectual hierarchy' হিসাবে কাজ করতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই নৈতিক প্রস্থানের সবই হিন্দুধর্মের মৌলিক ভিত্তি (essential of Hinduism) নয়। কিছু আছে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন 'non essential adjuncts', কিছু বিশুদ্ধ (pure ethics) আর কিছু ধর্ম বলে গণ্য হবার নয়— not religion। একে বঙ্কিম সামাজিক নৈতিকতা (social polity) বলে অভিহিত করেছেন। এ হচ্ছে জাতিভেদ ও সংক্রান্ত সংস্কার। তাঁর ভাষ— 'Caste, therefore, which in the polity, is non essential' (২:৩)।

জাতিভেদ যে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত অবিচ্ছেদ্য বস্তু নয়, তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র এনেছেন মধ্যযুগের ধর্মান্দোলন বিশেষত শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম-সমাজ সম্পর্কে; এইসব 'many Hindu sects' জাতপাত মানে না। ফলে জাতিভেদ সংক্রান্ত অন্যায়কে হিন্দু ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করার কারণই নেই।

।। ৭ ।।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উইলিয়াম হেস্টিকে আড়াল করার জন্য এই ঐতিহাসিক পত্রযুদ্ধের ইতি টানলেন। ১৪ নভেম্বর ১৮৮২ সালে তাঁর চিঠি 'The Recent Controversy' শিরোনামে ছাপা হলো। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন তাঁর সর্বশেষ পত্র। সেই পত্রের শিরোনাম 'The Recent Controversy' — প্রকাশ পেল ২২ নভেম্বর। এই গভীর আন্তরিক, স্বাদেশিকতায় উজ্জ্বল, আত্মোপলব্ধিতে দীপ্যমান পত্রধারা সমাপ্ত হলো— কার্যত বঙ্কিমচন্দ্রই শেষ কথা বললেন।

বঙ্কিম তাঁর তৃতীয় পত্রের শেষাংশে খানিকটা মজা করে লিখেছেন, 'you strip Hinduism of its rites, its idolatry, its castes; what do you then leave it?' ঠিকই তো, বঙ্কিমচন্দ্র রামচন্দ্র ছদ্ম নামে এই যুক্তির সবই খণ্ড খণ্ড করেছেন, প্রমাণ করেছেন নারকেলের ছোবড়া ছেড়ে সরস সুস্বাদু সারবস্তু বুঝতে হেস্টির নিশ্চয় আর ভুল হবে না : 'I leave the Karnel without the husk'।

তাঁর উদ্দেশে তীব্র ব্যঙ্গ করে হেস্টি লিখেছিলেন 'Ramchandra Redivivus' (১৭.১০.১৮৮২, ১:৬)। বঙ্কিম তাঁর চিঠির শেষে লিখলেন, একালের রামচন্দ্র পশ্চিমের অহঙ্কারী জনকের দেওয়া ধনুটি স্পর্শ করেই ভেঙ্গে ফেলেছেন। এবার কি তিনি সত্য-স্বরূপ জানকী-লাভ করবেন?

কৃষ্ণমোহনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে দ্বিধা করেননি বঙ্কিম। তিনি স্বীকার করেছেন 'কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসে তিনি তন্ত্রের নৈতিক সিদ্ধান্তকে হিন্দুত্বের সঙ্গে মিশিয়ে ভেবেছেন। কৃষ্ণমোহনকে স্বীকার করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'True Hinduism and Tantrikism are as much opposed to each other as light and darkness' (২:৪), তন্ত্র যদি অন্ধকার হয় হিন্দুধর্ম আলো— একে উচ্চস্তরের রূপক বলা যায়। তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের সম্পর্ক বঙ্কিম দেখিয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী চিঠিতে (২:৩)— যোগদর্শন ক্রমে তন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাননি বঙ্কিমচন্দ্র। লিখেছেন, তন্ত্র শেষ হোক, কিন্তু সে সম্পর্কে পঠনপাঠন যেন বন্ধ না হয়। 'Let Tantrikism perish --- but let it not perish unstudied' (২:৪)।

বঙ্কিম এই পত্রযুদ্ধের শেষে রামচন্দ্র ছদ্মনাম পরিহার করে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর সেই সুরসিক বক্তব্য, 'As it can no longer be necessary to write under an assumed name, I subscribe my won' । 'রামচন্দ্র' এসে আমাদের পিতৃপিতামহের শত-সহস্র বর্ষ ব্যাপী জীবনধারা ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করে গেলেন— বঙ্কিমচন্দ্র সেই দৈবী চমৎকার দেখালেন এই পত্রগুচ্ছে। দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষায় তাঁর ভূমিকা চিরস্থায়ী হলো সন্দেহ নেই।

অনুষঙ্গ।।

১. হরিদাস দাস সংকলিত 'শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', তৃতীয় খণ্ডে রামানুজাচর্যের আবির্ভাবকাল বলা হয়েছে '৯৩৮ শতাব্দের চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমী' (১৩৪৯ পৃঃ তৃতীয় স্তম্ভ; শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান; দ্বিতীয় খণ্ড; সংস্কৃত বুক ডিপো; কলকাতা; ১ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ)

২. তদেব ; ১২৪৮ পৃঃ।

৩. সারণিটি আমরা প্রস্তুত করলাম। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের নাম লেখেননি। ইংরেজি শব্দগুলি তাঁর ভাষা অবলম্বনে ব্যবহার করলাম।

৪. রচনাটির নাম 'Subjection of Women' (১৮৬৯)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' এই রচনাটির দ্বারা প্রভাবিত। ■

दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मंगलमय शुभ कामनाये
विश्व स्तर के पी. टी. एफ. ई. इन्सुलेटेड वायर,
केबल व नलिका, के निर्माता।

इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लें कि हम भारत राष्ट्र
को सशक्त, संगठित और सक्षम बनाने में सहयोग करें।

# गर्ग एसोसिएट्स
# प्राइवेट लिमिटेड

## M/s. Garg Associates Private Limited

Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3
Ghaziabad - 201 003 (U.P.) INDIA

e-mail : sales@gargasso.com

Phone : 0120-2712128/2712039

# সে এক মেয়ে

রমানাথ রায়

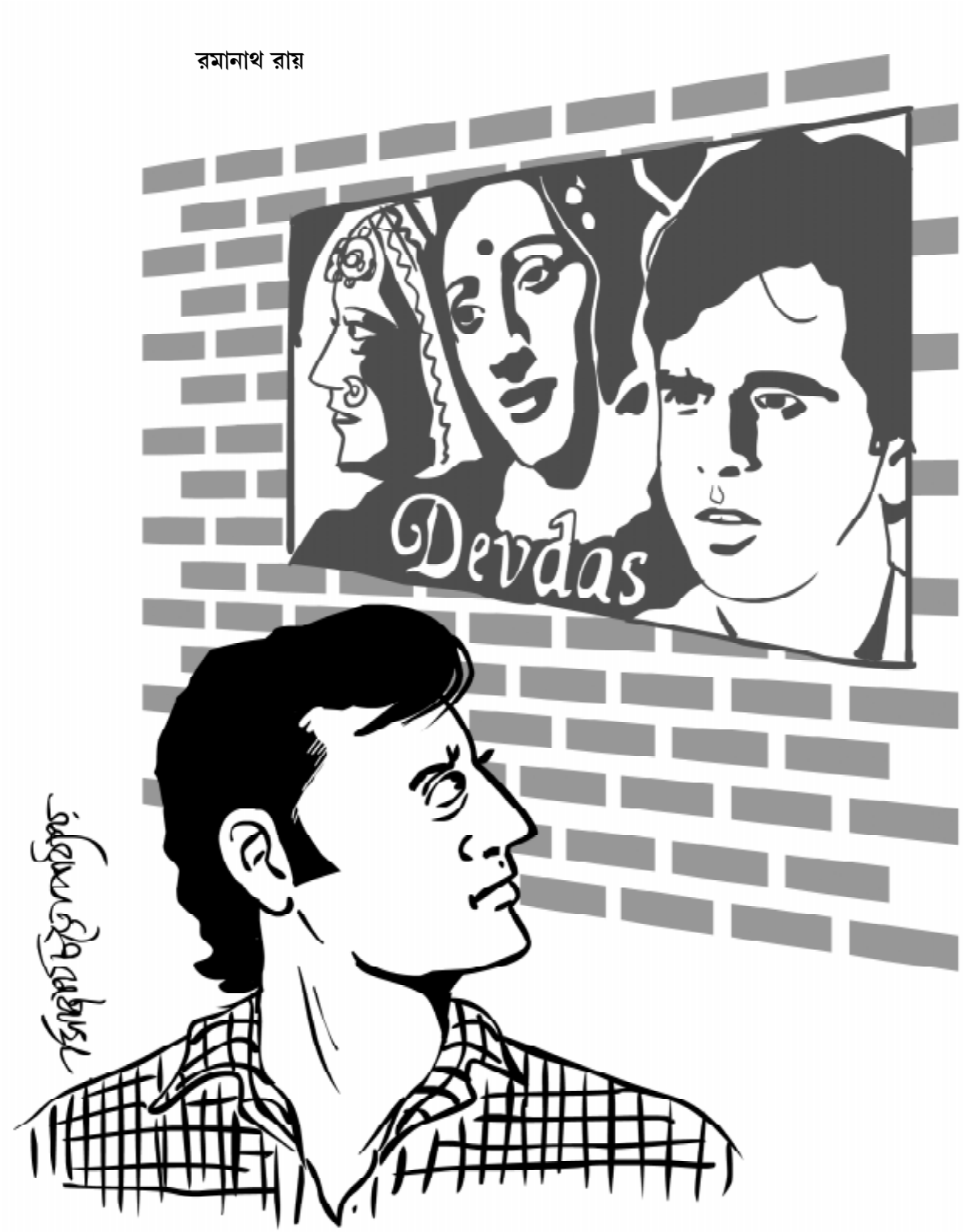

চিনি সিনেমায় নামবে। নামতেই পারে। তার জন্য আমার কিছু করার নেই। আমি বড়জোর বলতে পারি, সিনেমার পথটা খুব সহজ সরল নয়, তুমি এ পথ থেকে সরে এসো। কিন্তু চিনি কি আমার কথা শুনবে? না কি আমার কথা বুঝবে? প্রথমে ভেবেছিলাম, কথাটা বলব না। বলে লাভ হবে না। চিনি যা করতে চায় করুক। ও যদি সুচিত্রা সেন হতে চায়, হোক। আমার তাতে কোনও আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু আমি চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। কী করে থাকব? চোখের সামনে দেখব, চিনি প্রযোজক আর পরিচালকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সেটা কি আমার ভালো লাগবে? চিনির বাবা-মাই বা কীরকম? মেয়ের কাজে বাধা দিতে পারছে না! বুঝতে পারছে না এ পথে গেলে আর ফেরার রাস্তা নেই। হয় উত্থান, নয় পতন। আর পতন মানে যে সে পতন নয়, একেবারে নিদারুণ পতন। ব্যর্থতা, অপমান, অবহেলা জীবনকে কুরে কুরে খাবে। তখন কেউ ওর কথা ভাববে না, ওর দিকে ফিরেও তাকাবে না। সেটা কি ভালো হবে? আর যদি উত্থান হয়, সেই বা ক'দিনের? বয়স বাড়লেই আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না। সারা জীবন ধরে অভিনয় করে গেছে এমন অভিনেত্রীর সংখ্যা কম, খুবই কম। সুতরাং এ পথে চিনির না যাওয়াই ভালো। জানি, চিনি আমার কথা শুনবে না। না শুনলেও কথাটা বলা দরকার।

একদিন রাস্তায় ফুচকা খেতে খেতে চিনিকে বললাম, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

চিনি জানতে চাইল, কী কথা?

বললাম, ফুচকা খেতে খেতে সেকথা বলা যাবে না।

— কেন?

— খুব জরুরি কথা। একথা বলার জন্য কোথাও গিয়ে বসা দরকার। দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে খেতে একথা বলা যাবে না।

— তাহলে বোলো না।

— তা হয় না। কথাটা আমাকে বলতে হবেই। তোমার তা শোনা দরকার।

— কিন্তু কী এমন কথা তোমার যে ফুচকা খেতে খেতে তা বলা যায় না!

— খুব জরুরি কথা।

— আমি কোনও জরুরি কথা শুনতে চাই না। শুনতে ভালো লাগে না।

— কিন্তু কথাটা তোমার ভালোর জন্য বলতে চাই।

— আমার ভালো আমি বুঝব। তোমার কাছ থেকে তা জানতে চাই না।

— একথা বলতে পারলে?

— পারলাম।

— তাহলে আমার কিছু করার নেই। বলে আমি ফুচকার দাম মিটিয়ে চলে গেলাম। চিনির দিকে আর ফিরে তাকালাম না।

চিনি আমাকে পিছন থেকে ডাকল, এই! চলে যাচ্ছ কেন?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

।। ২।।

রাত্রিবেলা চিনি আমাকে ফোন করল।

— কী করছ?

— তা জেনে তোমার কী হবে?

— এটা আমার হওয়া বা না-হওয়ার প্রশ্ন নয়। একটা সাধারণ প্রশ্ন তোমাকে করেছি। তুমি তার উত্তর দেবে।

— কেন উত্তর দেব?

— তাহলে দিও না। — বলে চিনি ফোন বন্ধ করে দিল।

আমি এতে খুশি হলাম। আমি আমার গায়ের ঝাল মেটাতে পেরেছি। সত্যি, আমার খুব রাগ হয়েছিল। সিনেমায় নামার ব্যাপারে আমি ওকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কোথাও বসে কথাটা বোঝাব। এই কথাটা ছিল খুব জরুরি। ফুচকা খেতে খেতে একথা বলা যায় না। এটা চিনির জীবন-মরণের সমস্যা। আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম সিনেমায় নামার পথ মসৃণ নয়। প্রতি মুহূর্তে হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর হড়কে গেলে জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মতে, সিনেমায় নামার চেয়ে কবিতা লেখা ভালো। কবিতা লিখে টাকা হয় না ঠিকই, কিন্তু খ্যাতি হতে পারে। অবশ্য কবিতা লিখে খ্যাতি পাওয়াও সহজ নয়। কবিতা লিখে ছাপানোর সমস্যা আছে। বই বের করার সমস্যা আছে। টাকা থাকলে এসব কোনও সমস্যা নয়। নিজের পয়সায় কাগজ বের করা যায়। বই বের করা যায়। একে ওকে ধরে পুরস্কার পাওয়া যায়। আমি তার জন্য চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু কবিতা ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে না। যেমন, আমি আজও জানি না মানুষ কেন কবিতা লেখে। কী পায় তারা কবিতার মধ্যে। নিশ্চয় তারা আনন্দ পায়। নইলে তারা কবিতা লিখবে কেন? অনেকে কবিদের নিয়ে ঠাট্টা করে। তবু কবিরা কবিতা লেখা ছাড়ে না। সব অপমান উপেক্ষা করেই তারা কবিতা লেখে। এ বড় শক্ত কাজ। মনের জোর না থাকলে কবিতা লেখা যায় না। যাদের এই জোর থাকে না তারা একসময় কবিতা লেখা ছেড়ে দেয়। আমি কোনওদিন কবিতা লিখিনি। কবিতা লেখার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার দু-একজন বন্ধু কবিতা লিখত। তারা কোথাও কবিতা ছাপাতে না পেরে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে। আমি তাদের কবিতা পড়েছি। পড়ে কিছু বুঝতে

পারিনি। না পারলেও প্রশংসা করেছি। কারণ, কবিদের মনে দুঃখ দিতে চাই না। কবিদের মন খুব নরম হয় শুনেছি। এমনিই কবিরা কবিতার চিন্তায় ভালো করে খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না। দিন দিন তারা রোগা হয়ে যায়। আমি আজ পর্যন্ত কোনও স্বাস্থ্যবান কবি দেখিনি। সুতরাং তাদের কোনওসময় দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। প্রশংসায় তাদের খিদে হয়। ঘুম ভালো হয়। স্বাস্থ্যও ভালো হয়। তারা মনের আনন্দে থাকে। চিনি যদি সিনেমা ছেড়ে কবিতা লেখে তাহলে ভালো হয়। ওর কবিতা ছাপার জন্য আমি পত্রিকা বের করব। ওর কবিতার বই আমি বের করব। ছদ্মনামে আমি ওর বইয়ের প্রশংসা করব। তারপর আমি অনুষ্ঠান করে ওকে পুরস্কার দেব। আমি এই কথাটাই ওকে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও আমাকে পাত্তাই দিল না। ঠিক আছে, আমিও ওকে পাত্তা দেব না। ও যা চায় করুক।

এইসময় আবার চিনি ফোন করল—

— তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?

— করেছি।

— আমি দুঃখিত। তুমি এখন যা বলতে চেয়েছিলে বলো। আমি ধৈর্য ধরে শুনব।

— কিন্তু এখন আমার ধৈর্য ধরে বলার সময় নেই।

— কবে তোমার সময় হবে?

— বলতে পারছি না।

— তার মানে তুমি এখনও আমার ওপর রেগে আছো? একটুও রাগ কমেনি।

আমি এবার এর উত্তর না দিয়ে ফোন বন্ধ করে দিলাম। দিয়ে লাভ হলো না। চিনি একটু পরে আবার ফোন করল—

— আমি এবার তোমার ওপর রেগে গেছি।

— তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

— কী বললে?

— যা বলেছি তা তো শুনতেই পেয়েছ।

— তোমার কথা বলার এ কী ছিরি। আগে তো এভাবে কথা বলতে না। তুমি নতুন

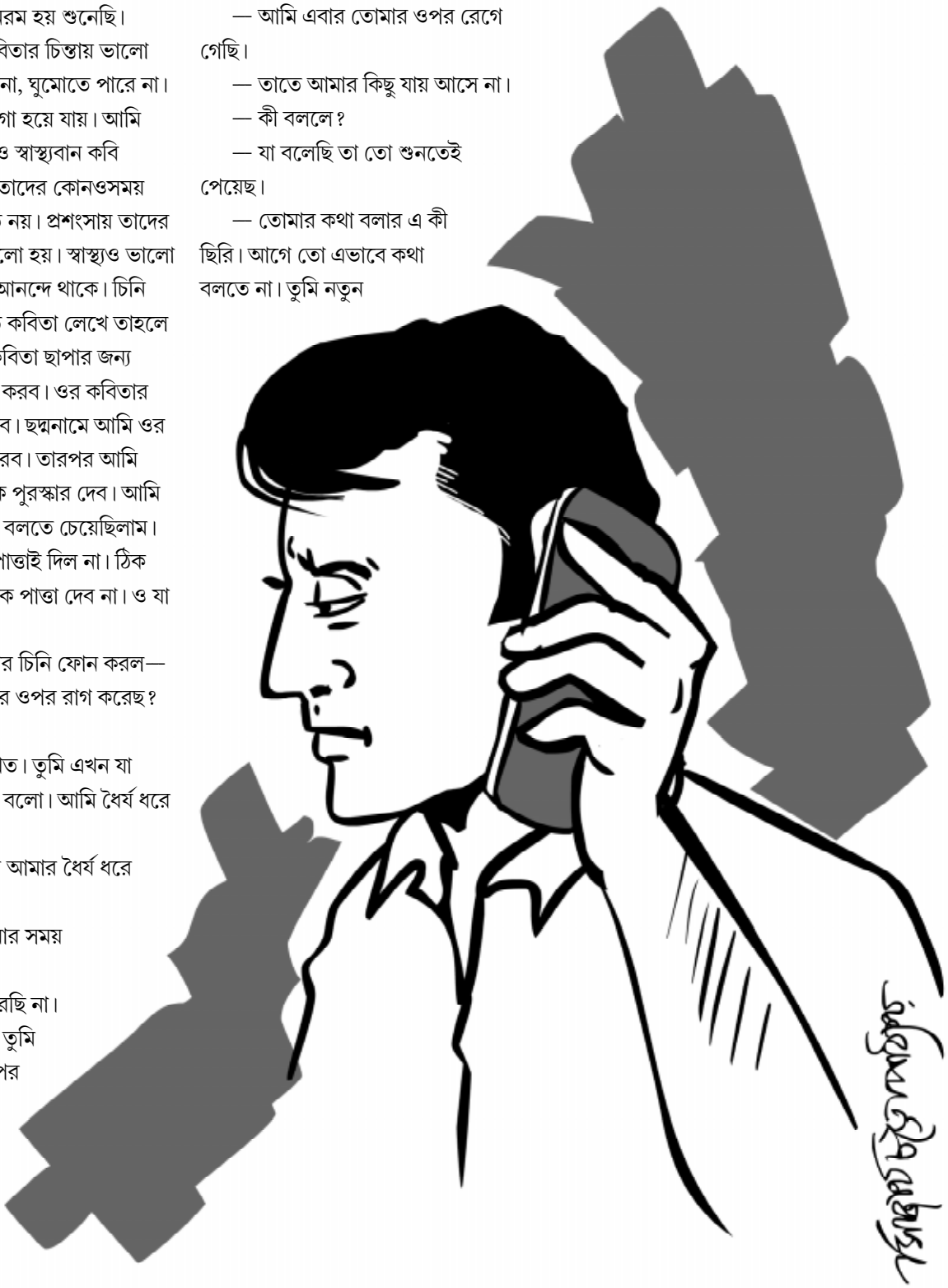

কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়েছ?

— আমি পড়িনি। তুমি পড়েছ।

— এই! বাজে কথা বোলো না।

— যা সত্যি তাই বলেছি। — বলে আমি আবার ফোন বন্ধ করে দিলাম।

চিনিও আর আমাকে ফোন করল না।

।। ৩।।

রাগ কারও বেশিদিন থাকে না। আমার রাগও আস্তে আস্তে পড়ে এল। তারপর শুরু হল অনুতাপ। মনে হল, আমি ভুল করেছি। আমি অন্যায় করেছি। কারণ, ফুচকা খেতে খেতে আমি কথাটা চিনিকে বলতে পারতাম। বললে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। রাগ দেখিয়ে চিনিকে ছেড়ে চলে আসা আমার ঠিক হয়নি। তারপর চিনি যখন আমাকে বারবার ফোন করল, তখন আমার কথা বলা উচিত ছিল। বারবার ফোন বন্ধ করে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার এবার ক্ষমা চাওয়া উচিত। বলা উচিত, আমি অন্যায় করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু চিনি কি আমাকে ক্ষমা করবে?

আমি একদিন চিনিকে ফোন করলাম। বললাম—

— আমাকে ক্ষমা করো।

চিনি বলল, আমি ব্যস্ত। পরে ফোন কোরো। — বলে ফোন বন্ধ করে দিল।

দুদিন পরে আবার ফোন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম—

— তুমি কি ব্যস্ত?

— হ্যাঁ।

— কথা বলা যাবে না?

— না। — বলে চিনি ফোন বন্ধ করে দিল।

আমি হাল ছাড়লাম না। দু-দিন পরে আবার ফোন করলাম। বললাম, তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল।

চিনি বলল, তোমার কথা শোনার সময় আমার নেই।

— তুমি কি ব্যস্ত?

— হ্যাঁ।

— তাহলে কখন ফোন করব?

— ফোন আর করতে হবে না।

— কেন?

— তুমি একটা অসভ্য, তুমি একটা ইতর, তুমি একটা জানোয়ার— বলে চিনি ফোন বন্ধ করে দিল।

বুঝলাম, চিনি আমার ওপর খুব রেগে গেছে। রাগা স্বাভাবিক। কিন্তু চিনির রাগ কবে পড়বে? আমি কতদিন অপেক্ষা করব? কতদিন?

এদিকে শীত চলে যাচ্ছে। বসন্ত আসছে। মিষ্টি বাতাস গায়ে এসে লাগছে। এইসময় একা একা ঘুরতে ভালো লাগে না। কেবলই চিনির কথা মনে পড়ে। মনে হয়, এইসময় চিনি পাশে থাকলে ভালো হতো। আমার ভালো লাগত। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা কথা বলতাম। ফুচকা খেতে খেতে আমরা কথা বলতাম। পার্কে বেঞ্চিতে বসে আমরা গল্প করতাম। এখন আর তা হবে না। বসন্ত চলে যাবে। আস্তে আস্তে গরম পড়বে। তখন আর গরমে হাঁটতে ইচ্ছে করবে না। ফুচকা খেতে ইচ্ছে করবে না। পার্কে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করবে না। দুঃখের কথা, কলকাতায় বসন্ত বেশিদিন থাকে না। দুদিন এসেই চলে যায়।

বুঝতে পারলাম না, এখন কী করব? চিনির বাড়ি যাব?

।। ৪।।

অনেক ভেবেচিন্তে কিছুদিন পর চিনিদের ফ্ল্যাটে গেলাম। চিনির বাবা ছিলেন না। ছিলেন চিনির মা। চিনির মাকে আমি মাসিমা বলে ডাকি।

মাসিমা আমাকে দেখে বললেন, এসো। বোসো।

আমি সোফায় বসলাম।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবে?

বললাম, না। — বলে জিজ্ঞেস করলাম, চিনি কোথায়?

মাসিমা অবাক হয়ে বললেন, তুমি কিছু জানো না?

— না।

— চিনি কিছু বলেনি?

— না।

— চিনি মুম্বই গেছে।

আমি এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

মাসিমা হেসে বললেন, চিনি একটা হিন্দি সিনেমায় ভালো সুযোগ পেয়েছে।

— নায়িকার ভূমিকায়?

— হ্যাঁ।

— এতো খুব ভালো খবর। কিন্তু আমাকে কথাটা জানাল না কেন?

— তা জানি না।

আমি একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, চিনি ফিরবে কবে?

— ফিরতে দেরি হবে।

— এতদিন থাকবে কোথায়?

— মুম্বইতে ওর মামার ফ্ল্যাট আছে। আপাতত ওখানেই থাকবে।

— যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কারণ মুম্বই গিয়ে থাকা খাওয়ার খুব অসুবিধা হয় শুনেছি।

— সে চিন্তা আমার নেই।

আমি এবার কী বলব বুঝতে না পেরে বললাম, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি চিনি একজন সফল নায়িকা হয়ে উঠুক। হয়ে উঠুক রেখা, শ্রীদেবী কিংবা প্রিয়াংকা চোপড়া।

মাসিমা বললেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। — বলে বললেন, মাঝে

মাঝে ওকে ফোন করো।

— করব। নিশ্চয় করব। — বলে আমি চলে এলাম।

রাস্তায় পা দিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হলো। আমি যে ভয় করেছিলাম, তাই হল। চিনির কোনও অভিজ্ঞতা নেই। চিনি জানে না সিনেমার জগত সুখের নয়। এখানে প্রতি মুহূর্তে বিপদ। প্রযোজক, পরিচালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মনে কী আছে তা জানার উপায় নেই। এখানে শুনেছি সকলেই সকলের প্রতিযোগী, সকলেই সকলের শত্রু। এখানে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। আমি তো এই কথাটাই চিনিকে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেকথা বলার সুযোগ হলো না। আমি সুযোগ পেয়েছিলাম, সে সুযোগ আমি নষ্ট করেছি। এখন আর কিছু করার নেই। মনে হচ্ছে আমি চিনিকে হারালাম। মনে হচ্ছে মুম্বই ওকে শেষ করে দেবে।

আমি চিনির জন্য দু-ফোঁটা চোখের জল ফেললাম।

।। ৫ ।।

ভুল, ভুল, চিনিকে শেষ করার সহজ নয়, এক বছরের মধ্যে চিনি বেশ নাম করে ফেলল। প্রথম সিনেমা 'দেবদাস'-এ পার্বতীর ভূমিকার চিনির অভিনয় সাড়া ফেলে দিল। কাগজে কাগজে ওর প্রশংসা ওর ছবি ছাপা হলো। দেবদাস-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল রণবীর। হিন্দিতে বহু 'দেবদাস' হয়েছে। কিন্তু এবারের দেবদাস আগের সব ছবিকে ছাপিয়ে গেল। ছবির পরিচালক একেবারে নতুন। সে এই ছবি করে পুরস্কার পেল। চিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেল। চিনির মধ্যে যে অভিনয়ের প্রতিভা ছিল তা আমি জানতাম না। 'দেবদাস' দেখে আমিও মুগ্ধ হলাম। তারপর চিনির মোবাইলে একটার পর একটা ফোন করলাম। মেসেজ পাঠালাম। কিন্তু চিনির কাছ থেকে কোনও উত্তর পেলাম না। ফোন করলে বেশিরভাগ সময় এনগেজড্ থাকে। নয় আউট অফ রিচ থাকে। শেষে হাফ ছেড়ে দিলাম। দিয়ে একদিন চিনির মার সঙ্গে দেখা করলাম। চিনির মা বললেন, চিনির সঙ্গে রোজ রাত্রে কথা হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি ফোন করলে ফোন এনগেজড্ থাকে কেন? চিনির মা বললেন, জানি না। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, চিনি ভালো আছে তো?। চিনির মা বললেন, হ্যাঁ, ভালো আছে। ও এখন নতুন

একটা সিনেমায় কাজ করছে। ছবিটার নাম 'দিল খুশ হ্যায়'। কথাটা শুনে চিনির মঙ্গল কামনা করে চলে এলাম।

এক বছর পরে 'দিল খুশ হ্যায়' মুক্তি পেল। প্রথম দিনেই টিকিট কেটে হলে ঢুকলাম। হল ভর্তি লোক। ছবি শেষ হতেই সকলের মুখেই চিনির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। আমারও চিনির অভিনয় ভালো লাগল। এখানে নায়ক হৃত্বিক রোশন। নায়িকা চিনি। গল্প এমন কিছু নয়। মান্ধাতা আমলের ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। তবে হৃতিকের নাচ আর চিনির অভিনয় দেখার মতো। আমি আবার ফোনে চিনিকে ধরার চেষ্টা করলাম। কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। শেষে হঠাৎ একদিন চিনিকে পেয়ে গেলাম। চিনি ফোন ধরেই বলল, আমি ব্যস্ত। আমাকে ফোন করে বিরক্ত করো না।

কথাটা শুনে আমার খারাপ লাগল। চিনি এখন বিখ্যাত অভিনেত্রী। কিন্তু একসময় চিনি তো আমাকে ভালোবাসত। আমিও চিনিকে ভালো বাসতাম। বিখ্যাত হয়ে কি সেসব কথা ভুলে গেল? সব অভিনেত্রীরাই কি এরকম হয়? হতেই পারে। আমাকে আর চিনির দরকার নেই। এখন তার দরকার প্রযোজক আর পরিচালকদের। এখন তাদের সঙ্গে ওঠাবসা। আমাকে আর চিনির মনে থাকার কথা নয়। চিনির ওপর আমার ভীষণ অভিমান হলো, রাগ হলো। ঠিক করলাম, চিনির কোনও সিনেমা আমি আর দেখব না। কিন্তু দেখতে না চাইলেও খবরের কাগজে চিনির ছবি দেখতে হয়। পড়তে হয় তার সম্পর্কে নানা গুজব ও কেচ্ছার কথা। একবার পড়লাম এক পরিচালকের সঙ্গে নাকি ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েছে। তারপর একদিন পড়লাম চিনি নাকি এখন এক শিল্পপতির সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে দিন কাটাচ্ছে। কাটাক। চিনি যা খুশি করুক। আমি আর ওকে ভালোবাসবো না। চিনি মুছে যাক। আমার জীবন থেকে মুছে যাক।

মা একদিন বলল, আমার বয়স হচ্ছে। এবার তুই বিয়ে কর।

বাবাও সেই কথাই বললেন।

আমিও বাধ্য ছেলে হয়ে বিয়ে করলাম। বউয়ের নাম তনু। তনুর বড় গুণ সে কবিতা লেখে না, গান গায় না, সিনেমায় নামার মোহ নেই। তনু সংসার করতে ভালোবাসে। আমি তো এরকম বউ চাই।

শান্তিতে আমার দিন কাটতে লাগল। আমি আর চিনির কথা ভুলেও ভাবি না। চিনি খ্যাতি নিয়ে সুখে আছে, সুখে থাকুক।

তিন বছর পরে আমার একটা মেয়ে হল। সবাই বলল, ঘরে লক্ষ্মী এসেছে। আমি তাই বললাম। আমি আদর করে মেয়ের নাম রাখলাম— পরি।

পরির বয়স দিনদিন বাড়তে লাগল। পনেরো বছর হতে না হতে পরি হিন্দি সিনেমার পোকা হয়ে উঠল। সব সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের নাম তার মুখস্থ। আমি সিনেমা বড় একটা দেখি না। ফলে কোন নায়ক বা নায়িকা উঠছে বা ডুবছে তার খবর আমি রাখি না।

একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, চিনির অভিনয় কেমন লাগে?

পরি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, চিনি! সে আবার কে?

— একসময় খুব নাম হয়েছিল।

— এবার মনে পড়েছে। চিনির একটা দুটো সিনেমা দেখেছি। রাবিশ।

আমি আর কিছু বললাম না। চুপ করে গেলাম।

।। ৬ ।।

কলকাতায় আবার দুদিনের জন্য বসন্ত এল। রাস্তায় রাস্তায় শিমূল গাছ লাল ফুলে ভরে গেল। সেই ফুলে দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হতে লাগল। কেন তা জানি না।

ঠিক এইসময় একদিন হঠাৎ একটা ফোন এল—

— হ্যালো...

— আমি চিনি বলছি।

— চিনি! কেমন আছে? কোথায় আছ?

— আমি ভালো নেই। এখন কলকাতায় সেই পুরনো ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছি।

— তোমার সিনেমার কী খবর?

— আমি আর সিনেমা করি না। — বলে একটু থেমে চিনি জিজ্ঞেস করল, আমি একটা কথা জানতে চাই।

— অনেক বছর আগে ফুচকা খেতে খেতে তুমি একটা কথা আমাকে বলতে চেয়েছিলে। কথাটা কী?

কথাটা মনে থাকলেও বললাম, ভুলে গেছি।

— না, তুমি ভোলোনি। তুমি একবার আমার কাছে আসবে?

— কেন?

— অনেক কথা আছে। আমরা আবার আগের মতো...

— কিন্তু আমার যে কোনও কথা নেই। আমার এখন বয়স হয়েছে।

— হোক বয়স। তুমি একবার এসো, প্লিজ

— চেষ্টা করব। — বলে ফোন বন্ধ করে দিলাম।

।। সমাপ্ত ।।

লেখকের কথা : এরপর নায়কের সঙ্গে চিনির দেখা হয়েছিল কিনা তা জানি না। জানি না দেখা হলেও তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল। সম্ভব হলে আপনারা সেটা কল্পনা করে নিন।

# ব্রিটিশ সংবাদপত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সারদা সরকার

সেদিন তাঁর ঠিকানা ছিল ওয়েস্ট লন্ডনের ১১২ গাওয়ার স্ট্রিট। ভারতীয় ছাত্রাবাসের একটি ঘরে এসেছেন বছর পঁচিশের এক তরুণ। সময়টা ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাস। লিঙ্কনস ইন-এ আইন পড়তে এসেছেন তিনি। উদ্দেশ্য যতটা না আইন পড়া, তার থেকে বেশি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়কে একদম সামনে থেকে দেখা। সেদিনের সেই তরুণ ছিলেন ভারতমাতার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। লিঙ্কনস ইন-এর আর্কাইভিস্ট মেগান ডানমেল আমাকে একটি নথি ইমেল করে পাঠান। সেখানে দেখি, লিঙ্কনস্ ইন-এ শ্যামাপ্রসাদের ছাত্র হিসাবে নাম নথিভুক্ত করার দিন তারিখ। আমি তাঁকে অনুরোধ করি, যাতে শ্যামাপ্রসাদের নাম তাদের বিখ্যাত অ্যালামনি লিস্টে ঢোকানো হয়। পরবর্তী ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের সময় তা নিশ্চয় করা হবে বলে কথাও দেন আর্কাইভিস্ট মেগান ডানমেল।

এই ঠিকানায় তখন আসতেন অগুনতি কৃতী মানুষ। এই বাড়িতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধীজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, লালা লাজপত রাই, সরোজিনী নাইডু, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজী ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে এসে এখানে একটি সর্বধর্ম সমন্বয় আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এসে এখানকার ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এই কবিতাটি উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন, যেটি এখনও এখানে বাঁধানো রয়েছে—

'Be not ashamed, My brothers, to stand
Before the Proud and powerful with
your White Robes of Simpleness.
Let your Crown of Humility, Your Freedom,
Build God's Throne daily upon the ample
Bareness of your proverty
And knowing what is Huge is not Great, and
Pride is not everlasting.'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই বাড়িটি বোমার আঘাতে প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়, তাই এখন মানচিত্র থেকে মুছে গেছে এই

*ভাগলপুরে সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভার কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার পথে শ্যামাপ্রসাদ (১৯৪২)।*

লিংকনস্ ইন : এখানেই ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ যে সব রাস্তা দিয়ে হেঁটেছিলেন সেই রাস্তাগুলো তো চেনা হলো। লন্ডনে ১৯২৬ সালে লিঙ্কনস্ ইন কেমন ছিল সেই ছবি আর রাস্তাগুলি মিলিয়ে নিলে মোটামুটি একজন পঁচিশ বছরের ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত আইনের ছাত্রকে দেখতে পাই আমরা, যিনি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়কে কাছ থেকে দেখছেন খুঁটিয়ে। এই অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই তাঁর কাজে লেগেছিল পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসেবে।

শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে ব্রিটিশ নিউজপেপার আর্কাইভে কী কী লেখা হয়েছে সেই নিয়ে একটু খুঁজে দেখা যেতেই পারে। চলুন না, একটু উঁকি দিয়ে দেখি সেই ইতিহাসের ইবাদৎখানায়। প্রথমেই বলে নিই— ব্রিটিশ সংবাদপত্রের পাতায় সেইসব ভারতীয়রাই গুরুত্ব পেয়েছেন, যাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক গুরুত্ব ভারতে ছিল অপরিসীম। সেদিক দিয়ে দেখলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, নেহরু, গান্ধীজীর পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ ব্রিটিশদের কাছে সেই গুরুত্ব পেয়েছিলেন।

মহাকালের কোনও টাইমলাইন হয় না, তাই আমরা এলোমেলো ঘুরে বেড়াব। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫৩— এই এগারো বছর মাত্র সময় দিয়েছে আমাদের ইতিহাস। সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল তাঁর, ততোধিক সংক্ষিপ্ত তাঁর রাজনৈতিক জীবন। সংবাদের শিরোনামে তিনি উঠে এসেছেন বারেবারে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের জন্যই।

প্রথম যে খবরটি আমাকে দুর্দান্তভাবে টানে, তা হল ১৯৫২ সালের পয়লা জানুয়ারি কভেনট্রি ইভিনিং টেলিগ্রাফ-এ বেরোনো কয়েকটি লাইন। তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেহরুর শাসনকাল। ব্রিটিশ মিডিয়া সবসময়ই গান্ধীজী অথবা নেহরুজীকে খুব সমীহ করে সম্মান জানিয়ে সংবাদ পরিবেশন করেছে। ভাবটা এই যে, এঁরা আমাদের লোক, অথচ সুভাষ বোস বা চন্দ্র বোস অথবা বোস কিংবা সুভাষচন্দ্রের সব খবরগুলিই কেমন যেন নির্লিপ্ত ভাবে বলা। ঠিক ঋণাত্মক নয়, কেমন যেন দায়সারাভাবে লেখা। যারা ব্রিটিশ শব্দবন্ধের সঙ্গে পরিচিত তারা বুঝবেন বিট্যুইন দ্য লাইন — এর মানে কী হয়। এই খবরগুলো লিখতে তাদের কত বিরক্তি হয়েছে। নেতাজীর খবরগুলো দেখে এটাই মনে হয়েছে, যদি সেইসময়ে 'মোস্ট হেটেড ইন্ডিয়ান' তক্‌মা ব্রিটিশ কাউকে দিত তাহলে তা বুঝি নেতাজীর পাওনা ছিল। শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ ব্রিটিশ মিডিয়ায় তেমন স্থান না পেলেও রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ স্বাভাবিকভাবে শিরোনামে উঠে এসেছেন এবং নেতাজীর স্টাইলে সমান দায়সারায় এই খবরগুলোও ব্রিটিশ মাধ্যম লিখে গেছে। ব্রিটিশ তখন ভারতবর্ষ

ঠিকানার তদানীন্তন বাড়িটি। তাই ইংলিশ হেরিটেজের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বসানো যায়নি শ্যামাপ্রসাদের স্মারকসূচক নীল ফলক। আবেদনপত্রের উত্তরে ইংলিশ হেরিটেজের ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড স্পেন্সার আমাকে লেখেন, শ্যামাপ্রসাদ লন্ডনে যে আরেকটি ঠিকানায় ছিলেন, সেটি খুঁজে বের করার জন্য। সুরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা স্মৃতিচারণায় বেশ একটি মজার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। উনি লেখেন, শ্যামাপ্রসাদ লন্ডনে এসে ওঠেন গাওয়ার স্ট্রিটে, কিন্তু কিছুদিন পর আরেকটি বোর্ডিং হাউজে উঠে যান। সেখানে ছিলেন তাঁর বন্ধু গুরুসদয় দত্ত (যদিও বয়সে তিনি শ্যামাপ্রসাদের থেকে কিছুটা বড়ই ছিলেন), সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং যতীন্দ্রমোহন মজুমদার। তিন বন্ধু মিলে খুব আনন্দ করে থাকতেন। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল লন্ডনে একটি স্পিরিট ফোটোগ্রাফির ইন্সটিটিউট চালাতেন। এঁরা তিনজনেই খুব আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুপরবর্তী আত্মা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় যোগদান করেন। স্পিরিট ফোটোগ্রাফিতে ধরা পড়ে শ্যামাপ্রসাদের মৃতা বোনের ছবি। গুরুসদয় দত্ত সদ্য তাঁর স্ত্রী সরোজনলিনীকে হারিয়েছিলেন, ছবিতে ভেসে ওঠে গুরুসদয় দত্তের স্ত্রীর ছবি। তাই জন্য এই তিন তরুণ আরও বেশি যেন বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। যাই হোক, এইসব ঘটনাই ঘটে সেই বোর্ডিং হাউজে থাকার সময়। সেই ঠিকানা বের করতে আবার দ্বারস্থ হই ব্রিটিশ অ্যানসেস্ট্রির সংগ্রহশালায়।

ডেটাবেস অনুসন্ধান করে যতীন্দ্রমোহন মজুমদারের ব্রিটেন ছেড়ে যাওয়ার দিনটির জাহাজযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে যে ঠিকানা দেওয়া ছিল, সেই অনুযায়ী শ্যামাপ্রসাদের সেই ঠিকানায়ই থাকার কথা। সেই ১২ নং আপার বেডফোর্ড প্লেসটিরও আর অস্তিত্ব নেই আজ। তার বদলে সেখানে আজ ইন্সটিটিউট অব এডুকেশানের বিশাল বাড়িটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই ইংলিশ হেরিটেজের তরফ থেকে ব্লু প্ল্যাকের সম্ভাবনা আর রইল না বটে,

ছেড়ে চলে গেছে বা যাবে বলে মনস্থ করেই নিয়েছে, তাই হয়তো নেতাজীর তুলনায় ঝাঁঝটা কিছুটা কম। এইভাবে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমেই ব্রিটিশ বুঝিয়ে দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের কাছে নেহরু-গান্ধী মিত্র হলেও, সুভাষচন্দ্র এবং শ্যামাপ্রসাদ মোটেই তা ছিলেন না।

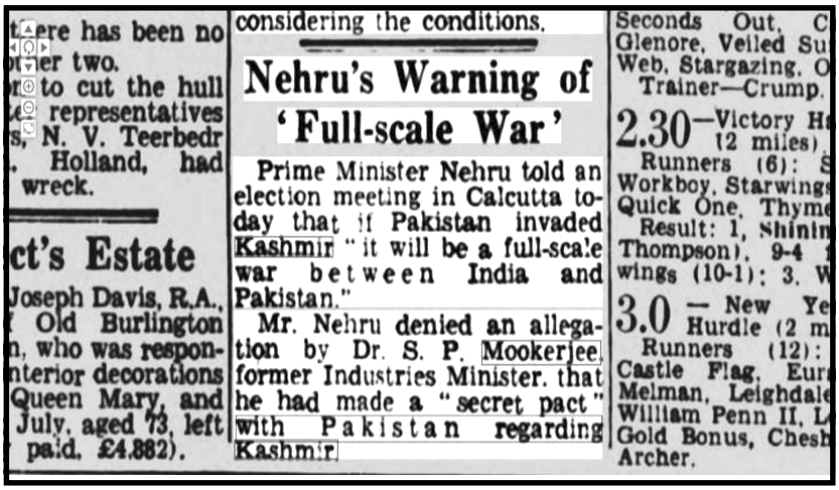


t■ere has been no
■er two.
■ to cut the hull
■ representatives
s, N. V. Teerbedr
. Holland, had
wreck.

ct's Estate
Joseph Davis, R.A.,
Old Burlington
n, who was respon-
nterior decorations
Queen Mary, and
July, aged 73, left
paid, £4,882).

considering the conditions.

## Nehru's Warning of 'Full-scale War'

Prime Minister Nehru told an election meeting in Calcutta today that if Pakistan invaded Kashmir "it will be a full-scale war between India and Pakistan."

Mr. Nehru denied an allegation by Dr. S. P. Mookerjee, former Industries Minister, that he had made a "secret pact" with Pakistan regarding Kashmir.

Seconds Out, C
Glenore, Veiled Su
Web, Stargazing, O
Trainer—Crump.
2.30—Victory H
(2 miles)
Runners (6): S
Workboy, Starwings
Quick One, Thyme
Result: 1, Shinin
Thompson), 9-4
wings (10-1): 3, W
3.0 — New Ye
Hurdle (2 m
Runners (12):
Castle Flag, Eur
Melman, Leighdale
William Penn II, L
Gold Bonus, Chesh
Archer.

খবরে লেখা হয়েছিল 'নেহরু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ যুদ্ধঘোষণা করবেন এমন হুমকি দিয়েছেন। নির্বাচনী সভা করতে এসে কলকাতায় নেহরু বলেন, যদি পাকিস্তান কাশ্মীরে আক্রমণ করে তাহলে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পুরোপুরি যুদ্ধে নামবে। সেই সঙ্গে তিনি প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। শ্যামাপ্রসাদ অভিযোগ এনেছিলেন যে নেহরু কাশ্মীর প্রসঙ্গে 'গোপন বোঝাপড়া' করে নিয়েছেন।' এটুকুই খবর— কিন্তু ভাবছি সেই সময়কার নেহরু, যখন ভারতবর্ষে তাঁর কথাই শেষ কথা, সেই সময়কার ব্রিটিশ রাজতন্ত্র তখনও সদ্য মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে ঢেঁকুর তোলার আবহে বাস করছে, সেই সময় ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, যার পাকিস্তানপ্রেম এবং হিন্দুবিদ্বেষ কোনও কল্পকথা নয়, সেই অবস্থান থেকে নেহরুকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়াটা সহজ কথা ছিল না বৈকি। দেখুন, কভেন্ট্রি ইভিনিং টেলিগ্রাফ সেটা অস্বীকার করতে পারেনি।

পরের সংবাদটি অনেকগুলি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে নিতান্ত নিরপেক্ষ উদাসীনতায়। কিন্তু ব্রিটিশ ভদ্রতায় হুমড়ি খেয়ে নিন্দে করার কালচার নেই— যারা জানে তা জানে, এই নিরাসক্ত ভাবেই তারা তাদের মনোভাব বুঝিয়ে দেয়। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী তখন জেলে, ভারত ছাড়ো আন্দোলন তখন তুঙ্গে, 'হিন্দু চিফ' অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। কিন্তু কেন? আসুন ব্রিটিশ দৈনিক 'ডেইলি মিরর'-এর সাংবাদিকের মুখে খবরটা শুনি।

'হিন্দু মহাসভার (হিন্দু জনমতের দক্ষিণপন্থী শাখা, লক্ষ্য করুন পুরো হিন্দু জনমত নয় কিন্তু— শুধু হিন্দুদের মধ্যেকার দক্ষিণপন্থী ভাগের কথাই বলা হয়েছে) প্রধান ড: মুখার্জি ভাইসরয়ের কাছে আবেদন জানিয়েছেন গান্ধীর সঙ্গে ভারতবর্ষের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিনি দেখা করতে চান। তিনি মুসলমান নেতা মি: জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনা সেরে নিয়েছেন এবং দিল্লি থেকে রিপোর্ট বেরিয়েছে যে, ড: মুখার্জি ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা এবং অন্তর্বর্তীকালীন স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ভারতীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ নিতে বলেছেন। ব্রিটিশ ইউনাইটেড প্রেসের মতে, এরকম করা গেলে হিন্দু-মুসলিম বোঝাপড়া হতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। অন্যদিকে ভাইসরয় কাউন্সিলের ডিফেন্স মিনিস্টার, মুসলিম নেতা স্যার ফিরোজ খান নুন বলেছেন, 'কংগ্রেসের এই ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কারণ তারা দেশের শত্রু অর্থাৎ হিন্দু সংগঠন এবং শত্রুপক্ষের (অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে গান্ধীর আলোচনায় বসা) এবং শত্রুপক্ষের (ফিফথ্ কলামনিস্ট) কাজে গোপনে সাহায্য করে। মিস্টার চার্চিল হাউস অফ কমন্স-এ যা বলেছেন সেগুলো ভারতের বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ না করলেও সেটাই সত্যি। তিনি কোনওরকম রাখঢাক না রেখে বলেছেন হয়তো, কিন্তু যা বলেছেন সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।'

ডেইলি মিরর-এর খবরটি পরিবেশনের স্টাইলটা এমনই যে দেখে মনে হয় যেন চার্চিলের হিন্দু এবং ভারতবিরোধী জঘন্য বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ফিরোজ খান নুনের বক্তব্যটা বড় করে লেখা জরুরি ছিল। শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগ, ব্রিটিশ ইউনাইটেড প্রেসের বক্তব্য সবই যেন অত্যন্ত মামুলি, নেহাতই নিরাসক্ত ভাবে বলা। যেন না বললেও চলে, অথচ উপেক্ষাও করা যাচ্ছে না। তাই এভাবে বলতে হয় যে হিন্দু চিফ গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলতে চান। মানে গান্ধীর কোনও দোষ নেই, কিন্তু কংগ্রেস দূষিত হচ্ছে এই সব ফিফথ কলামনিস্টদের' পাল্লায় পড়ে। 'ফিফথ কলামনিস্ট' মানে যারা দেশের শত্রুদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখে এবং সমর্থন করে। এখানে তাহলে 'ফিফথ কলামনিস্ট' কারা? বুঝতে অসবিধা হয় না, ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং ফিরোজ খান নুনের মতো মুসলিম নেতার মতে এই দক্ষিণপন্থী হিন্দুরাই দেশের শত্রু। এই খবরটিই প্রমাণ করছে স্বাধীনতার প্রাক্ লগ্নেই ব্রিটিশ এবং মুসলিম লিগ — উভয়েরই একটি জাতক্রোধ ছিল শ্যামাপ্রসাদের প্রতি।

এই দিনের খবর অন্য একটি কাগজে বেরোয় 'বেলফাস্ট নিউজ লেটার' বলে। লেখাটি সরাসরি তুলে দিলাম এখানে। লেখাটির প্রথম অংশ খুব মন ছুঁয়ে যাওয়া। ইতিহাস বইতে হয়তো এঁদের নাম নেই, কিন্তু এই বৈষ্ণবে পট্টনায়ক আর পবিত্রমোহন প্রধানকে আমরা জানতে পারলাম এই কাগজের মাধ্যমেই। স্বাধীনতা সংগ্রামী এই দুই ভারতীয়কে ধরিয়ে দিলে যথাক্রমে ১৫০ পাউন্ড এবং ১১০ পাউন্ড দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তখনকার হিসেবে সে বড় কম টাকা নয়। ২৬ আগস্ট পট্টনায়ক প্রায় ১৬ জন বিপ্লবীর সঙ্গে বোমা বন্দুক, তির-ধনুক নিয়ে পুলিশ চৌকি আক্রমণ করেছিলেন। আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সরকারি নথিপত্রে। শুধু তাই নয়, পরের বার প্রায় ৮০০ জন গ্রামবাসী নিয়ে আবার ৪ সেপ্টেম্বর আরেক জায়গায় হানা দিয়েছিলেন। যেসব গ্রাম তাদের মদত দিয়েছে তাদের প্রত্যেককে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বিশাল জরিমানা দিতে বাধ্য করেছে। পবিত্রমোহন প্রধানের কথা এই স্বল্প পরিসরে আর বেশি লেখা হয়নি। কিন্তু ওড়িশা সরকারের সরকারি নথিতে তাঁদের অসীম বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে আরও লেখা হয়েছে যে, মুসলিম লিগ নেতা মৌলবি মহম্মদ আবদুল ঘানি খান দাবি করেছেন, ব্রিটিশ সরকারের আইন অমান্য করলে যে সাধারণ নাগরিকদের অত্যধিক জরিমানা করা হচ্ছে তার থেকে মুসলমানদের ছাড় দেওয়া হোক। এখানেও প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, মুসলিম লিগ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে অবশিষ্ট ভারতবাসীর থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে আলাদা করে রাখতেই চেয়েছে।

যখন সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীরা কেউই রেহাই পাচ্ছে না, স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হবার জন্য, তখন মুসলিম লিগ নেতার এহেন আচরণ মনে সন্দেহ আনে বৈকি! এখানে শুধুমাত্র লেখা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বসে ঠিক করতে চান, স্বাধীনতার রূপরেখা কী হবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই বা কীরকম হবে। সেখানে মহম্মদ আলি জিন্নাহ বলেছেন, পাকিস্তানের দাবি না মানা অবধি

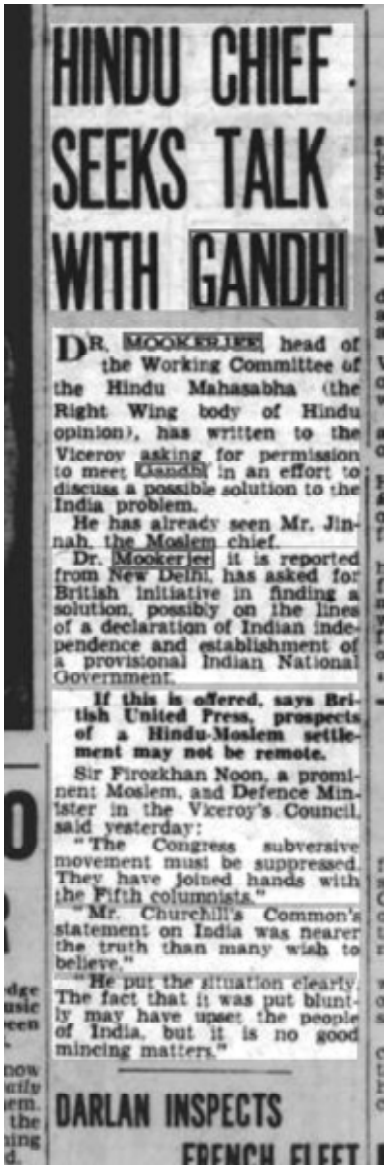

HINDU CHIEF SEEKS TALK WITH GANDHI

DR. MOOKERJEE, head of the Working Committee of the Hindu Mahasabha (the Right Wing body of Hindu opinion), has written to the Viceroy asking for permission to meet Gandhi in an effort to discuss a possible solution to the India problem.

He has already seen Mr. Jinnah, the Moslem chief.

Dr. Mookerjee, it is reported from New Delhi, has asked for British initiative in finding a solution, possibly on the lines of a declaration of Indian independence and establishment of a provisional Indian National Government.

**If this is offered, says British United Press, prospects of a Hindu-Moslem settlement may not be remote.**

Sir Firozkhan Noon, a prominent Moslem, and Defence Minister in the Viceroy's Council, said yesterday:

"The Congress subversive movement must be suppressed. They have joined hands with the Fifth columnists."

"Mr. Churchill's Common's statement on India was nearer the truth than many wish to believe."

"He put the situation clearly. The fact that it was put bluntly may have upset the people of India, but it is no good mincing matters."

DARLAN INSPECTS

FRENCH FLEET

মুসলিমরা কোনও সরকারে অংশ নেবে না। জিন্নাহের বক্তব্য যে, ভারতের তিন-চতুর্থাংশ তো হিন্দুরা নিয়েই নিয়েছে, মাত্র এক চতুর্থাংশ ভাগ মুসলমানদের। তাতেও কি খুশি নয়! মুসলমানদের স্বার্থে তিনি আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে পারেন যেটা কংগ্রেসের চেয়ে আরও অনেক বেশি মাত্রায় ভয়ঙ্কর হবে সে কথা যেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মনে রাখে। এর কয়েক বছর পরই ১৯৪৬ সালে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ভিতর দিয়ে তা করেও দেখিয়েছিলেন জিন্নাহ। প্রকাশিত খবরটি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

TERRORISTS Reward for Arrest of Leaders Bombay, Sunday --- The state of Orissa to-day announced rewards of 150 and 119 respectively for the arrest of the leaders, Vaishnave Patnaik and Pabitramohan, for two attacks on a police station. Villages which gave assistance to Patnaik's gang have been fined. An official said to-day that Patnaik, with 16 others, armed with guns, arrows and other weapons, raided the police station on August 26 and burned the records of the court and other public institutions. Patnaik led nearly 800 men in a later attack on September 4, said the official. The situation was now completely normal. Four effigies of Mr. Churchill were burnt in various parts of Bombay today. At one incident 12 people were arrested.

-- Reuter. Maulvi Muhammed Abdulghani, of the Moslem League, has resolution down exempt Moslem British India from the payment of collective fines imposed under the Defence of India rules in connection with the civil disobedience move-

ment.' The Hindu Mahasabha Committee, it is understood, has applied for permission to interview Gandhi and other Congress leaders now in detention. Dr. S.P. Mookherjee, working President of the Mahasabha, and others of the committee stated; We feel that our efforts have reached a stage which demands immediate consultation with Mr. Gandhi and the leaders of the Indian National Congress.' Pakistan Mr. Jinnah, the Moslem leader, said today that the Moslems would unprepared to enter a provisional Government unless their demand for Pakistan were met. With this provision in favour of any amount of transfer of power,' he said. According to our latest resolution on Pakistan it means that three quarters of India goes to the Hindus and one quarter to the Moslems, but even then the Hindus want to diddle us. Any provisions outside the framework of the present constitution must necessarily involve radical and fundamental constitutiional changes, and once the changes have been made it would be diffcult for us to attain after the war the guarantee on which we are insisting.' Mr. Jinnah said it was in the power of the Moslems to cause the British Governmenrt far greater embrrassment that the Congress Party, but they were not disposed to take such action however they might deplore Brithsh policy in India during the past three years. Blunt, but true Firoz Khan Noon, defence Minister, said today that the continuation of the status quo regard to the political situation will not make any difference to defence, the situation was under control'।

INDIAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

Conflicting Views on Gandhi's Campaign

NEW DELHI, Sunday.

MR. CHURCHILL'S statement on India, and the Commons debate, will influence the Indian Legislative Assembly, which opens to-morrow to discuss the political situation.

To the motion by Mr. M. S. Aney, leader of the Assembly: "That the situation in India be taken into consideration." Dr. P. N. Bannerjee, Nationalist Party Leader, has tabled an amendment urging release of all Congressmen and the formation of an Indian

it was put bluntly may have upset the people of India, but it is no good mincing matters."

Regarding the possibilities of some kind of interim Government being formed on a wider basis, he said that he saw little hope. "The British sold the Moslems to Congress through Sir Stafford Cripps, and it is up to the Hindus—the senior partner in the country—to make a move. Congress, however, I believe, will be incapable of a change of heart whether in prison or out."

About Britain's attitude to India he said: "My experience during a long stay in London was that the British have such an inferiority complex about the Indian problem that all they want is to

১৯৪২ সালে অনেক কাগজে শ্যামাপ্রসাদের নাম পাওয়া যায়। এই বছর ২১ নভেম্বর একটি খবর আসে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলার মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। দু-লাইনের এই খবর আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে কীইবা দরকার ছিল এই খবর ছাপানোর। কিন্তু শিরোনাম থেকে সব স্পষ্ট হয়ে যায়— 'হিন্দু রিজাইনস্'— যেন একটাই পরিচয় ছিল তাঁর।

পরের খবরটিও বেলফাস্ট নিউজ লেটারের। ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন মঙ্গলবার ওয়েভেল প্ল্যান চলছে সিমলায়। রাজগোপালাচারী গান্ধীজীকে বলেছেন অতিথি হিসেবে আসতে, কিন্তু মিটিংয়ে যেন তিনি যোগদান না করেন। সারা ভারত থেকে এসেছেন নেতারা, মিটিংও বেশ ভালো চলছে। ভাইসরয় মাঝেমাঝে গল্‌ফ খেলছেন। এবার একটা না একটা সেটেলমেন্টের রাস্তা বেরিয়ে যাবেই। শেষ দুটি লাইনে লেখা হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পুণায় হিন্দুদের একটা মিটিং ডেকেছেন। আর সেখানে তিনি বলেছেন, ওয়েভেল প্ল্যান যাতে কার্যকর না হয়, তার জন্য আরও অনেক বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এমনকী ১৯৪২ সালের আন্দোলনও যাতে ম্লান হয়ে যায় এরকম। ব্রিটিশ মিডিয়ায় এই ধরনের খবর বারবার এসেছে। যেন চার্চিলই বিভিন্ন কাগজের মাধ্যমে কথা বলছেন। বোঝাই যাচ্ছে, 'হিন্দু নেতা' শ্যামাপ্রসাদকে একেবার অস্বীকার করতে পারছে না ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম।

১৯৪৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণের পর, অনেক কাগজে এসেছে শ্যামাপ্রসাদের নাম, আর এস এসের নাম। হার্টলেপুল নার্দার্ন ডেইলি মেল লিখছে 'আজ মহাত্মা গান্ধীর

অস্থিভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন করে পণ্ডিত নেহরু লোকসভায় ভাষণ দিয়েছেন— 'ভারতীয় হিসেবে এবং হিন্দু হিসেবে তিনি লজ্জিত যে আমরা আমাদের ভারতীয়দের মূল্যবান রত্ন গান্ধীজীকে রক্ষা করতে পারিনি। আরও লজ্জার বিষয় যে, একজন হিন্দু এই জঘন্য কাজ করেছে আর যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনি শুধু একজন প্রকৃত ভারতীয় নয়, একজন প্রকৃত হিন্দুও বটে। সংসদের বাইরে যখন স্লোগান উঠছিল আর এস এস মুর্দাবাদ, কারণ গান্ধীর হত্যাকারী একজন আর এস এস সদস্য, তখন নেহরু বলেন, এই ঘৃণার বাতাবরণ সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। ভারতীয় পুলিশ দেশের নানা জায়গা থেকে হিন্দু উগ্রবাদীদের অ্যারেস্ট করেছে, তেমন আবার পাল্টা আক্রমণেরও খবর পাওয়া গিয়েছে। উন্মত্ত জনতা বম্বেতে হিন্দু মহাসভার সদস্যদের বাড়িতে পাথর ছুঁড়েছে, আর তার মোকাবিলা করতে পুলিশ ২ রাউণ্ড ওপেন ফায়ার করেছে। কলকাতায় ক্রুদ্ধ জনগণ ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাড়িতে ঝড়ের মতো পাথর ছুঁড়েছে।'

উপরের লেখাটি মোটামুটি আক্ষরিক অনুবাদ করে দেওয়া। এই দিনের আরও কয়েকটি কাগজে একই ঘটনার কথা বেরিয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, গান্ধী হত্যার সঙ্গে আর এস এস কোনওভাবে জড়িত না হলেও, ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম প্রথম থেকেই তাতে আর এস এসের নাম জড়িয়ে দিতে চেয়েছে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের শেখানো অভিযোগই করেছে কংগ্রেস।

ডার্বি ডেইলি নিউজ কাগজেও একই কথা— প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী এবং হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্টের কলকাতার বাড়িতে ভাঙচুর করেছে উন্মত্ত জনতা। পুলিশ এসে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে তাদের এবং দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। বাড়ির সামনে সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়েছে। হায়দরাবাদে বিজয় কেস্কার নামের হিন্দু মহাসভার (হিন্দু জঙ্গি সংগঠন) একজন নেতার বাড়িতে একদল কংগ্রেস কর্মী চড়াও হয়। মহাসভার এই জঙ্গি নেতার হাতে বন্দুক ছিল এবং তার বাড়ির ছাদের ওপর মহাসভার পতাকা অর্ধনমিত করা ছিল না। তার হাতের বন্দুক কেড়ে নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে পতাকা নামিয়ে দেয় কংগ্রেসের কর্মীরা। ব্যাঙ্গালোরে মহাসভার কর্মী জি ভি আমাচারের বাড়ির সামনে বোম ফাটালে তার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব হিন্দু নেতাদের সাধারণ মানুষের ক্ষোভের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পুলিশ যথেষ্ট সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। নাগপুরে যথেচ্ছ লুঠতরাজ চলেছে এইসব হিন্দু নেতাদের উপর এবং এইসব নেতাদের বাড়ির সামনে সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে খবরগুলি সাজিয়েছে, যাতে মনে হয়, সামগ্রিকভাবে হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু নেতৃত্বই গান্ধী হত্যার জন্য দায়ী। বলে না দিলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, ভারতের হিন্দু নেতাদের হেয় করার একটি লক্ষ্য ব্রিটিশদের ছিল। পরে ব্রিটিশদের স্থির করে দেওয়া এই লক্ষ্যেই কমিউনিস্টরা এদেশে হিন্দু নেতৃত্বকে বারবার আক্রমণ করেছে।

গান্ধী হত্যার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার খবরটি দেখে ১৯৮৪ সালের ইন্দিরা গন্ধী হত্যার পর দেশজুড়ে শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষের ওপর যা অত্যাচার হয়েছে সেকথা মনে করিয়ে দেয়। ব্রিটিশ কাগজে লিখছে, হিন্দুদের ওপর যথেচ্ছ লুঠতরাজের কথা, তার মানে সেই নির্মমতার আসল রূপ না জানি কেমন ছিল। বারবার জঙ্গি সংগঠন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে হিন্দু মহাসভাকে। যেমন, আজকেও হিন্দু সংগঠনগুলিকে জঙ্গি আখ্যায় দেগে দিতে পছন্দ করেন নেহরুবাদী সেকুলার ও বামপন্থীরা। আজকের জমানায় বসে আমরা বুঝি আসল জঙ্গিপনা কাকে বলে, সেদিন ব্রিটিশরাও তা জানত। তবু তারা বারবার অতিরঞ্জিত করে লিখেছে এই শব্দবন্ধটি— শুধু নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য। গান্ধীহত্যা খুব খারাপ, কিন্তু হিন্দু মহাসভাও তো কোনও নিষিদ্ধ সংগঠন ছিল না। গান্ধী হত্যার প্রেক্ষিতটা বিচার করার প্রয়োজন নেই? আবার এই শ্যামাপ্রসাদের প্রয়াণেই যে কলকাতা শোকে আকুল হয়ে উঠেছিল, তাঁর শেষযাত্রায় যে নেমেছিল লক্ষ মানুষের ঢল, তাও ব্রিটিশ সংবাদপত্র অস্বীকার করতে পারেনি। সে প্রসঙ্গ শেষে আসছি।

১৯৪৭-এর এই খবরটিতে এসে থমকে দাঁড়াই আমরা। ব্রিটিশরা এমন নগ্নভাবে কাউকে আক্রমণ করে সাংবাদিকতা করে এমনটা বড় একটা দেখা যায় না। ভারতীয়দের এরা ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না— কেবলমাত্র কটূক্তি শোনা গেছে নেতাজির বিরুদ্ধে, বাকি সবাই যেন সত্যি এলেবেলে। জিন্না যেমন এদের গুড বয়, তাঁর সাত খুন মাফ, নেহরুকে এরা ঠিক তেমন একটা বিপদ বলে মনে করেনি কখনও। গান্ধীজী যেন এদের শিখণ্ডী। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের লেখা এই খবরটি বেরিয়েছিল দ্য স্কটসম্যান কাগজে। শিরোনাম ছিল— 'Influence of the Mahasabha' Threat to Permanent Peace in India, Hatred of Moslems, by O. M. Green. "In the tension and fever of India today, one of the most dangerous elements is the Mahasabha (Great Society), quintessence of extreme Hinduism and hatred of Moslems. Its numbers are comparatively small, its political influence uncertain. But its ability to excite the passions of the Hindu mob by inflammatory slogans (just as Moslems may be roused by the cry 'Islam in danger') is justly feared. Its leaders have been conspicuous for their violence and pugnacity -- the once famous Dr. S. P. Mookherjee, formerly 'Vice-Chancellor of Calcutta University; the late,

still more militant Dr. Moonje, founder of two particularly aggressive movements, suddhi and sangathan. (roughly 'purification' and 'self-fortification'); and Mr. V. D. Savarkar, born in 1883, a barrister of London, is the typical aggressive Hindu. He was transported in 1909 for 14 years for abetting a murderous communal crime, and has since known the inside of an internment camp. He is not only anti-Moslem but anti-Congress, accusing it of 'a pro-Moslem mentality' and of having 'betrayed Hindu interests a hundred times'. The Mahasabha was born in 1906, in answer to the formation of the Moslem League at Dacca the year before. At that time, and for some years afterwards, the Mahasabha's aims were mainly religious. The Brahmins were alarmed by the numbers of Hindus who were being converted either to Christianity or Islam. Hinduism, it was said, was becoming lukewarm: intersive work was begun for the rescue and reconversion of backsliders."

India for Hinduism : "But religion in India soon merges into politics. By 1923 the Mahasabha had definitely 'put itself on the map' in its annual session at the sacred city of Benares, and a number of vigorous provincial branches were formed. By 1931 it was imperial enough to have its own representatives at the Round Table Conference in London. A few yeas later it was represented in the enlarged Council of the Viceroy. From the Benares session onwards the Mahasabha became more and more anti-Congress. Its watchword was 'India for Hinduism' and it has always violently opposed Mr. Ramsay MacDonald's 'Communal award' in 1932, by which separate communal electorates were secured in the provincial elections for Moslems, Sikhs, Christians, British-Indians and Europeans. Congress was bitterly attacked for accepting the award which, said the Mahasabha 'flouts the unanimous opinion of the Hindus.' With the election of Mr. Savarkar as President in 1937, the energies of

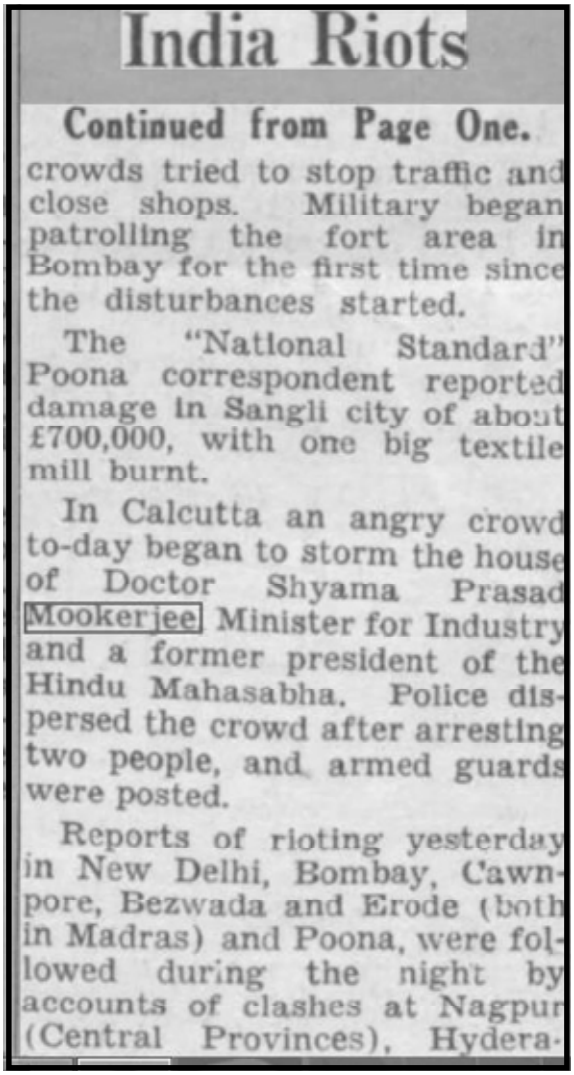

India Riots

Continued from Page One.

crowds tried to stop traffic and close shops. Military began patrolling the fort area in Bombay for the first time since the disturbances started.

The "National Standard" Poona correspondent reported damage in Sangli city of about £700,000, with one big textile mill burnt.

In Calcutta an angry crowd to-day began to storm the house of Doctor Shyama Prasad Mookerjee Minister for Industry and a former president of the Hindu Mahasabha. Police dispersed the crowd after arresting two people, and armed guards were posted.

Reports of rioting yesterday in New Delhi, Bombay, Cawnpore, Bezwada and Erode (both in Madras) and Poona, were followed during the night by accounts of clashes at Nagpur (Central Provinces), Hydera-

the Mahasahba took a pronounced military turn. The formation of Hindu gymnasiums, rifle clubs and volunteer militia corps was preached. On the outbreak of the Second World War in 1919, the Mahasabha (like the Moslems, but unlike Congress) pledged its support to Britain. But, said Mr. Savarkar at the 1940 session at Madura in South India' we must study how the war can best be used to promote the cause of pan-Hinduism. We should participate in the Government a war effort in order to bring about the militarisation of our people. "Partition Threat' : And in 1942 the Mahasabha called upon its followers to give no support to the Congress's rebellion and Gandhi's 'Quit India' slo-

gan. Leading members of the Mahasabha openly declared (though needless to say this will not be found in official documents) that Hindus must assist in the war in order to become proficient in the use of arms against the day. When they would have to fight the Moslems. For 20 years past the Mahasabha has stood for the independence of India, but an India uncompromisingly dominated by Hinduism; and for unyielding opposition to any party which agreed to concessions to the Moslems. When the partition of Bengal 'between Pakistan and Hindustan was decided upon, the Mahasabha proclaimed that unless Calcutta; was awarded to Hindustan, it would bring out every worker, from dockers to mill hands on strike. The peaceful acceptance of the partition by the Moslems (though it lost them Calcutta) has hitherto averted any distrubances in Bengal. How far the Mahasabha's influence may have contributed to the Punjab massacres it is impossible to say though some fiery words by its leaders have been repotred, but the peace which Mr. Nehru's Government is striving to restore, will hardly be secure until the fieriness of the Mahasabha has somehow been quenched.

উপরের লেখাটি বাংলায় অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় সেটা আজকের দিনের তথাকথিত সেকুলার বিদ্বজ্জনের ভাষণ বলে মনে হয়। তাহলে কি ব্রিটিশরাই এই হিন্দু বিদ্বেষটা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল? এবং এতো সুন্দর করে মস্তিষ্ক প্রক্ষালন করে দিয়ে গিয়েছিল যে সেই ভূত আজও মাথা থেকে নামলো না! বীর সাভারকরের সম্বন্ধে কত কুৎসা রটনাই যে শোনা যায় এদের মুখে। এই খবরের কাগজগুলো পড়লে কিন্তু মনে হয় না কোথাও কখনও এক মুহূর্তের জন্যও সাভারকর আপোশ করেছিলেন। বরং, এই সংবাদটি পড়লে বোঝা যায়, সাভারকর ব্রিটিশদের রণকৌশল শেখার জন্যই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। সাভারকর আপোশ করলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে এত নিন্দামন্দ তাঁর জন্য বরাদ্দ থাকতো না। উল্টে থাকতো নেহরুর মতো একটা ফিল গুড অনুভূতি। ভাবটা এই যে, আহা নেহরু এত কষ্ট করে শান্তি আনতে চাইছে আর এই হিন্দু মহাসভার উগ্রপন্থী হিন্দুগুলো তাদের মুসলমানদের প্রতি হিংসা দিয়ে সব বানচাল করে দিচ্ছে। সত্যি কি তাই ছিল সেদিনের আবহাওয়া? একদিকে ব্রিটিশের উস্কানি, জিন্না এবং নেহরু দুজনেরই জাতির পিতা হবার উগ্র বাসনা, সাধারণ দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানকে লড়িয়ে দিয়ে দেশভাগ করে নেওয়া আর তার সমস্ত রকম দায় হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। আজ ব্রিটিশ নেই, ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কিন্তু সেই ভাবনা তারা আমাদের মনে গেঁথে দিয়ে গেছে। সব দোষ হিন্দুদের? সব দোষ একদা বিখ্যাত কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদের? ততোধিক ব্রিটিশের চোখে জঙ্গি হিসাবে চিহ্নিত মুঞ্জের (ড. মুঞ্জে আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের রাজনৈতিক অভিভাবক ছিলেন), অথবা সাভারকরের মতো বিপ্লবীর, যাঁকে অমানুষিক অত্যাচার করেও ব্রিটিশদের সখ মেটেনি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই লড়াইটা তারা চালিয়ে দিল মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের লড়াই বলে। এই ঢালের আড়ালে বসে কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদী এই ব্রিটিশ জাত ছুরি চালিয়ে গেছে সন্তর্পণে। অখণ্ড স্বাধীন ভারতমাতাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। আর তার সঙ্গে জুটেছে কিছু স্বার্থপর লোভী রাজনীতিকরা। সব দেশে সব কালে এরা ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানেও ব্যতিক্রম হয়নি।

১৯৫১ সালের ২২ অক্টোবর ডান্ডি ক্যুরিয়র রিপোর্ট করছে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার কথা। কংগ্রেসের মুসলমান তোষণের বিরোধিতা করেই এই পার্টির সৃষ্টি হয়েছে। যদি ব্রিটেন এবং অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশগুলি ইউনাইটেড নেশনস এবং অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানকে সবসময় সমর্থন করা এবং ভারতের বিরোধিতা করা বন্ধ না করে, তাহলে এই পার্টি ভারতকেও কমনওয়েলথ থেকে বের করে আনবে বলেছে। কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে ইউ এন এ আর কোনও কথা হতে পারে না। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ— একথাও জনসঙ্ঘ বলেছে।

১৯৫৩ সালের ১২ মার্চের কভেন্ট্রি ইভিনিং টেলিগ্রাফে বলা হয়, আইন অমান্যকারী হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ-সহ আরও তিনজন হিন্দু মহাসভার নেতাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন লোকসভার সদস্য, বাকি তিনজন হিন্দু মহাসভার মেম্বার। সাধারণ জনসভায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এঁরা মিটিং মিছিল করছিলেন, তাই এঁদের আটক করা হলেও পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নির্ভীক শ্যামাপ্রসাদকে আমরা এখানেও দেখি। আপোশহীন নিরলস সংগ্রামের জন্য তাঁকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমও অস্বীকার করতে পারেনি। তিনি হয়তো ভালোবাসা পাননি এদের কাছ থেকে, পাবার কথাও নয়, উল্টে ঘৃণাই পেয়েছেন। কিন্তু তারা তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসকে অস্বীকার করতে পারেনি কখনও। তাই স্বাধীনতার পরেও ব্রিটেনের স্থানীয় সংবাদপত্রে তিনি এসেছেন নিয়মিত নেগেটিভ নিউজ হিসেবে।

নিচের এই খবরটি দেখে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের অনেকেরই পূর্বপুরুষের দেশভাগের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঠাকুমা দিদিমার কাছে এই গল্প শুনে আমরা অনেকেই বড় হয়েছি। গল্প শুনেছি রাতারাতি ঘরবাড়ি সব ফেলে প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে আসার করুণ কাহিনি। কলকাতায় একজন আত্মীয়ের বাড়ি পুরো গ্রাম উজাড় করে উঠে আসা, শিয়ালদহ স্টেশনে হিন্দু বাঙালির মর্মান্তিক কষ্ট। এসব কি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল? নাহলে উনি শ্যামাপ্রসাদের ওপর এত রেগে গেলেন কেন? মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি এই হতভাগ্য হিন্দু বাঙালিদের জন্য একজন মাত্র মানুষ লড়ে যাচ্ছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে। জোর গলায় বলছেন, তিনটি মাত্র পথ আছে। এক নম্বরে দেশভাগকে অস্বীকার করা হোক। 'নালিফাই' যাকে ইংরাজিতে বলে। দুই নম্বরে হিন্দুদের জন্য আলাদা টেরিটোরি অর্থাৎ অঞ্চল ভাগ করে দেওয়া হোক, আর তিন নম্বরে পুরোপুরি সংখ্যালঘু বিনিময় করা হোক। নেহরু তখন কী বলছেন? দৃশ্যত রেগে যাচ্ছেন (মার্কেডলি অ্যাংগ্রি)। কতটা রাগ হলে ব্রিটিশ মিডিয়া লিখতে পারে এই কথা। নেহরুজী বলছেন তবে কি যুদ্ধ করতে চাও? এই হতভাগ্য বাঙালিগুলো কি এতটা ইম্পার্টন্ট যে তাদের জন্য যুদ্ধ করতে হবে? প্রথম দুটো অপশান মানে তো যুদ্ধই। আর তিন নম্বর অপশান কি সম্ভব, পাগলের প্রলাপ বলছ? আমার সাধের সেক্যুলার ভারতবর্ষ থেকে পুরো মুসলমান পপুলেশানকে চলে যেতে বলব? তাতে আমার দেশের ধর্ম নষ্ট হবে না? নেহরুজী তখন কি একবারও ভেবেছিলেন সেইসব হিন্দু পরিবারের কথা, যারা হপ্তাভর রেল লাইন ধরে হাঁটছে এপারে আসবে বলে অথবা যেসব মেয়েরা আসার পথে ধর্ষিতা হয়েছে বা খুন হয়েছে, যেসব শিশু পথশ্রমের ক্লান্তি সইতে না পেরে মারা গেছে তারা কেন নিজের দেশে বাড়ি ভিটে ছেড়ে পালিয়ে আসছে দলে দলে লাখে লাখে? পপুলেশান ক্লিন্সিং শুধু একতরফা হবে? শ্যামাপ্রসাদ বলছেন দু-তরফের বিনিময়ের কথা। এই হিন্দু বাঙালি যারা এখনও পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে গেল তাদের মনোবল তলানিতে এসে ঠেকেছে। সরকার রিফিউজিদের সামলে উঠতে পারছে না। তাদের কথা ভেবে সরকারের কি কিছু করার নেই? এখানেই শ্যামাপ্রসাদ অদ্বিতীয়, প্রকৃত অর্থেই চাম্পিয়ান। তাই সভায় উপস্থিত কংগ্রেসের অন্যান্যদেরও মনে হয়ে যে, 'চ্যাম্পিয়ন অব রিফিউজি' অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদের কথাটা একেবারে ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। এই কথাগুলো যখন ব্রিটিশ লোকাল নিউজপেপারে বেরোয় নির্লিপ্তভাবে অথচ না বললে নয়— শ্যামাপ্রসাদ তো তাঁর একার জন্য কিছু বলেননি, ব্যক্তিগত লাভের জন্যও নয়। এর সঙ্গে যে একটা বৃহত্তর জনজীবন জড়িত। তাই শ্যামাপ্রসাদের কথা সেদিন শুনতে বাধ্য হয়েছিল শুধু ব্রিটিশ মিডিয়া নয়, এমনকি পরমভট্টারক নেহরুজিও। খবরটা হুবহু তুলে দেওয়া হলো।

INFLUENCE OF THE MAHASABHA

Threat to Permanent Peace in India

HATRED OF MOSLEMS

By O. M. GREEN

In the tension and fever of India to-day, one of the most dangerous elements is the Mahasabha (Great Society), quintessence of extreme Hinduism and hatred of Moslems. Its numbers are comparatively small, its political influence uncertain. But its ability to excite the passions of the Hindu mob by inflammatory slogans (just as Moslems may be roused by the cry "Islam in danger") is justly feared.

Its leaders have been conspicuous for their violence and pugnacity—the once-famous Dr S. P. Mookerjee, formerly Vice-Chancellor of Calcutta University, the late, still more militant Dr Moonje, founder of two particularly aggressive movements, sudhi and sangathan (roughly, "purification" and "self-fortification"); and Mr V. D. Savarkar, President of the Mahasabha since 1937.

Mr Savarkar, born in 1883, a barrister of London, is the typical aggressive Hindu. He was transported in 1909 for 14 years for abetting a murderous communal crime, and

Few Living on Dole

Such figures are impressive. The Indian Government states that excepting recent migrants from East Pakistan and 90,000 other who are all without means of support, no Indian Refugee is now living on the dole. Excepting migrants from East Pakistan; there's the rub. More than two million have fled into West Bengal and Assam since last January. And though the central Government has allowed a grant of three and three quarter million pounds for their rehabilitation, the refugees keep coming and the money spreads thinner and thinner. In Parliament this week. Pandit Nehru, Indian Prime Minister, spoke twice in support of his April agreement with Liauqat Ali Khan, Prime Minister of Pakistan. On the second occasion he grew markedly angry with Dr Shyamaprasad Mookherjee, the Bengal refugees champion who spoke sombrely of the minority's utter lack of confidence in East Bengal. Dr Mookherjee demanded either the annulment of partition,

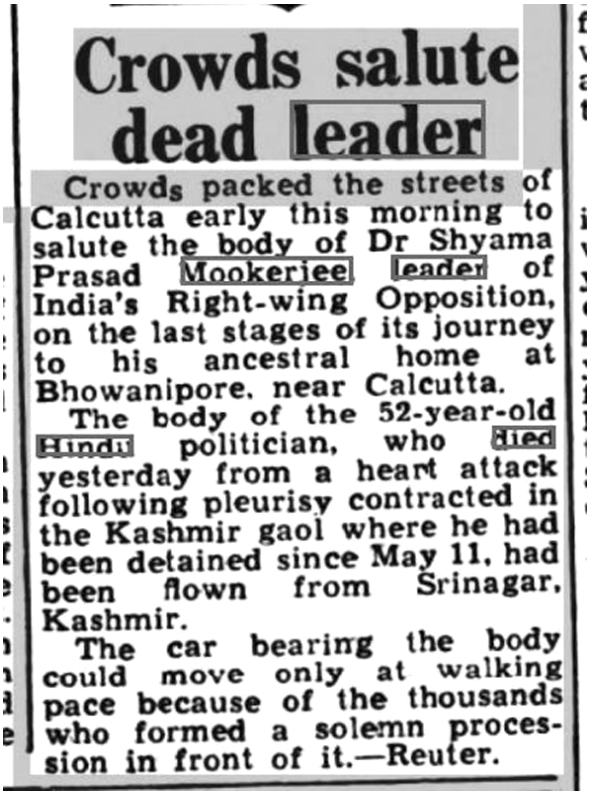

# Crowds salute dead leader

Crowds packed the streets of Calcutta early this morning to salute the body of Dr Shyama Prasad Mookerjee leader of India's Right-wing Opposition, on the last stages of its journey to his ancestral home at Bhowanipore, near Calcutta.

The body of the 52-year-old Hindu politician, who died yesterday from a heart attack following pleurisy contracted in the Kashmir gaol where he had been detained since May 11, had been flown from Srinagar, Kashmir.

The car bearing the body could move only at walking pace because of the thousands who formed a solemn procession in front of it.—Reuter.

the cession of territory by Pakistan, or a total exchange of populations. Mr. Nehru reported that the first two meant war and the last was both impracticable and also denied India's belief in the secular state. Nevertheless, it seemed in the lobbies that the majority of Congressmen felt that Dr Mookherjee had a case, felt that it was impossible to treat any further with such a recalcitrant as Pakistan. Against this was the certain knowledge that they could not do without Nehru.

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর আবহে চলে এসেছি আমরা। বীরগতি প্রাপ্ত এই বিপ্লবীর মৃত্যু স্বাভাবিক যে ছিল না তা নিয়ে ব্রিটিশ মিডিয়ারও খুব একটা সন্দেহ ছিল না।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে সাণ্ডারল্যাণ্ড ডেইলি ইকো অ্যান্ড শিপিং গ্যাজেটে এই খবরটা বেরোয়। কৈলাসনাথ কাটজু পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছেন কথাটা, এমনকী বলছেন এটা মনগড়া কথা। বেআইনিভাবে বন্দি করা আর তার পরে চিকিৎসায় অবহেলা করা দুটি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগের উত্তরে খোঁজখবর করার বালাই নেই, উল্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, আরে মশাই এসব কিছু নয়। আমি কাশ্মীরি গভর্নমেন্টের কাছে কৃতজ্ঞ যে তারা শ্যামাপ্রসাদের সম্পূর্ণ দেখভাল করেছিল। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে এভাবে শেষ না করে দিতে পারলে তাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে সেকথা বুঝতে দেরি হয়নি এইসব অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের। এখন মনে হয়, আজকের এই যে রাজনৈতিক নেতাদের নৈতিক অবক্ষয় দেখি দলমত নির্বিশেষে, সেই সময় থেকেই তার বীজ বপন শুরু হয়েছিল। স্বাধীন ভারত তো পেলাম আমরা অজস্র রক্তক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে, তারপরেও নিজেদের গদির সুরক্ষা করতে যা সব অনৈতিক কাজকর্ম শুরু হয়েছিল তার চরম অবস্থা বোধকরি আজ আমরা দেখি রাজনীতির লোকজনের মধ্যে। তাই বুঝি সাধারণ আম আদমি যারা তারা সক্রিয় রাজনীতির লোক দেখলে সন্দেহ করি, দূরে সরে যাই, এমনকী স্থান বিশেষে ঘৃণাও করি। ইতিহাস তো শুধু অতীত নয়, ভবিষ্যতেরও পূর্বাভাস দেয়। অস্বাভাবিক মৃত্যুকে আইনসিদ্ধ করে দেওয়ার শুরু কি তখন থেকে? শ্যামাপ্রসাদই কি স্বাধীন ভারতে প্রথম রাজনৈতিক হত্যা? সম্ভবত তাই।

Hindu Was 'Liquidated'

The Indian Government today rejected a demand for an open inquiry into the death Dr. S. P. Mookherjee who died in Srinagar last June while under detention - for entering Kashmir without a permit. Dr Mookherjee was leader of the Right-Wing Hindu Jan Sangh party and a former Minister in the Indian Government. Dr Khare, a leader of the Hindu Mahasabha Party, today pressed a demend in the house of the people (Lower house) for an inquiry. He accused the Indian and Kashmiri Governments of the 'liquidating' Dr Mookherjee and described his death as a medical and political liquidation of an inconvenient political opponent. For the medical part, Srinagar was responsible', alleged.

Mr Chatterjee president Mahasabha said Dr Mookherjee had been illegally detained with the Indian Government's Connivance and Conspiracy. The minister of home affairs of sates Dr Katju replied that it was a 'figment of imagination'. To suggest there had been any conspiracy.

He was satisfied that Kashmiri Government had done everything it could to provide medical aid for Dr Mookherjee and there was no need for en-

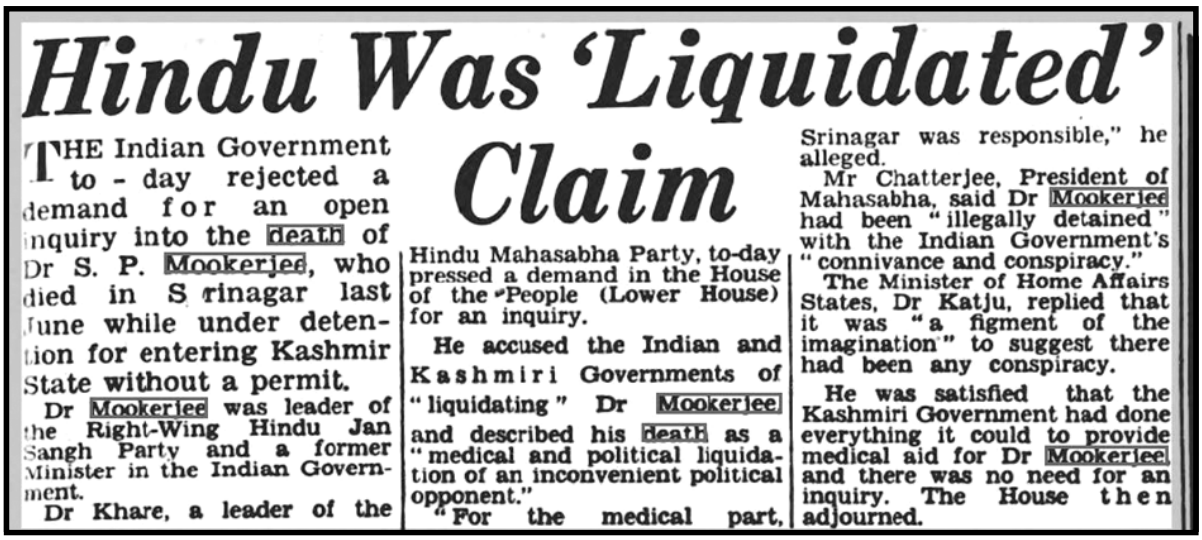

# Hindu Was 'Liquidated' Claim

THE Indian Government to - day rejected a demand for an open inquiry into the death of Dr S. P. Mookerjee, who died in Srinagar last June while under detention for entering Kashmir State without a permit.

Dr Mookerjee was leader of the Right-Wing Hindu Jan Sangh Party and a former Minister in the Indian Government.

Dr Khare, a leader of the Hindu Mahasabha Party, to-day pressed a demand in the House of the People (Lower House) for an inquiry.

He accused the Indian and Kashmiri Governments of "liquidating" Dr Mookerjee and described his death as a "medical and political liquidation of an inconvenient political opponent."

"For the medical part, Srinagar was responsible," he alleged.

Mr Chatterjee, President of Mahasabha, said Dr Mookerjee had been "illegally detained" with the Indian Government's "connivance and conspiracy."

The Minister of Home Affairs States, Dr Katju, replied that it was "a figment of the imagination" to suggest there had been any conspiracy.

He was satisfied that the Kashmiri Government had done everything it could to provide medical aid for Dr Mookerjee, and there was no need for an inquiry. The House then adjourned.

quiry. The house then adjourned.

২৩ জুন কভেন্ট্রি ইভিনিং টেলিগ্রাফের পাতায় এলো শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর খবর। শীর্ষনাম এল 'রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু রাজনৈতিক বন্দী হয়ে।'

''আজ শ্রীনগরে হিন্দু দক্ষিণপন্থী বিরোধী (জনসঙ্ঘ) নেতার জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে হৃদরোগ বলা হয় এবং তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫২ বছর। মে মাসের ১১ তারিখ থেকে তিনি বন্দি আছেন শ্রীনগরের জেলে। প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে গতকাল শ্রীনগরের একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ড. মুখার্জি এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে কাশ্মীরে উপযুক্ত নথিপত্র ছাড়া প্রবেশ করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য, বাঙ্গালি, একজন বড় মাপের নেতা শ্যামাপ্রসাদ, নেহরুর খুব বড় সমলোচক ছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম ক্যাবিনেটে তিনি শিল্পমন্ত্রী ছিলেন ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ অবধি। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতি নেহরুর নীতি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে সাধারণ নির্বাচনের কিছু আগে তিনি নিজের রাজনৈতিক দল গঠন করেন। সেই জনসঙ্ঘ দিল্লি সহ উত্তরভারতে যেখানেই পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু জনগণ রয়েছে সেইসব জায়গায় যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।''

এতো গেল শুধু খবর। কিন্তু ব্রিটিশ মিডিয়া এইটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, উদ্বাস্তু জনগণের মাঝে শ্যামাপ্রসাদের অপরিসীম জনপ্রিয়তার কথা। তাই একটি কাগজে তাঁকে রিফিউজিদের চ্যাম্পিয়ন বলা হয়েছে। প্রশ্নটা হলো, যাদের উচ্চাশার কারণে হিন্দুদের রিফিউজি হতে হল, সেসব রাজনীতিবিদ সেদিন কি করছিলেন? অসহায় মানুষদের দুঃখ-কষ্ট সেদিন জাতির পিতাও বোঝেননি বা বুঝেও কিছু করেননি। আর চাচা তো নিজে প্রধানমন্ত্রী হবার উচ্চাশা পূরণের জন্য ব্রিটিশের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলেন। নাহলে এই লক্ষ লক্ষ গৃহহারা মানুষগুলোর কথা তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না কেন? বাঙ্গালি হিন্দু যারা দলে দলে এলো সেদিন তাদের কথা নেহরুর মনে সেভাবে স্থান পেল না কেন?

এভাবেই শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুর হৃদয়সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন— শিল্ড ডেইলি নিউজে এই খবরটি পড়লে বোঝা যায়—

Crowds salute dead leader

"Crowds packed the streets of Calcutta early this morning to salute the body of Dr Shyama Prasad Mookherjee, leader of India's Right-wing, opposition. On the last stages of its journey to his ancestral home at Bhowanipore, near Calcutta. The body of the 52 year old Hindu politician, who died yesterday from a heart attack following pleurisy contracted in the Kashmir gaol where he had been detained since May 11, had been flown from Srinagar, Kashmir. The car bearing the body could move only at walking pace because of the thousands who formed a solemn procession in front of it. - Reuter.

শ্যামাপ্রসাদের শববাহী গাড়ি সেদিন মানুষের ভিড়ে চলতে পারছিল না। হাজার হাজার মানুষ সেদিন পথে নেমেছিল তাদের প্রাণের প্রিয় নেতাকে চোখের জলে বিদায় দিতে। সেদিন যারা শ্যামাপ্রসাদকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, ইতিহাস তাদের ক্ষমা

করবে না। মানুষের আদালতে নাই বা হোক ঈশ্বরের বিচারসভায় তার শাস্তি হবেই। আমরা অনেকেই বড় হয়েছি বাম শাসনকালে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি আমরা প্রগতিশীল, সেকুলার— বেশিরভাগই আবার কোনও না কোনওভাবে বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আসা উৎখাত হওয়া হিন্দু বাঙ্গালিই। শ্যামাপ্রসাদের অবদানের কথা জানানো হয়নি আমাদের প্রজন্মকে, কলকাতা শহরকে আজ আমরা 'টেকন ফর গ্রান্টেড' নিয়ে নিয়েছি, এই কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ আমাদের নিজেদের, আমাদের মাতৃভূমি, কত কবিতা গান বেঁধেছি, 'এই শহর জানে আমার প্রথম সব কিছু' কিন্তু কোথাও উল্লেখ করিনি শ্যামাপ্রসাদের। শুধু ভবানীপুরের রাস্তার নামটুকু ছাড়া আমাদের এই প্রজন্ম শ্যামাপ্রসাদের কথা কিছুই জানে না। নিজের বলে ধরে নেওয়া শহরটার প্রতিটি ধূলিকণার পিছনে শ্যামাপ্রসাদের যে এত বড় লড়াইটা ছিল তা বাঙ্গালিদের সুকৌশলে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডে নয় নয় করে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আছি, এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছি— এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি স্কুলশিক্ষায় ব্রিটিশরা ইতিহাস বিকৃত করেনি কোথাও। ফ্রান্স সহ সারা ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহ কম হয়নি, ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধই তার মধ্যে বেশি, কিন্তু আজকের সেকুলার ব্রিটেন খুবই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে রয়েছে। তবে তাই বলে ইতিহাসকে বিকৃত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেখায়নি কখনও। শ্যামাপ্রসাদের সেদিনের লড়াইকে অস্বীকার করে আজকের কলকাতাকে সাজানো অকৃতজ্ঞতা। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি, আত্মঘাতী বাঙ্গালি যতই লিবারেল বা সেকুলার হোক, তার প্রকৃত ইতিহাসটা জানা অত্যন্ত জরুরি। ব্রিটিশ আর্কাইভে ব্রিটিশ জার্নালিস্টদের লেখা বিবরণ বা মূল্যায়ন দেখে অবাক হয়েছি। তাদের নির্লিপ্ততা, কারণে অকারণে জঙ্গি বা টেররিস্ট আখ্যা দেওয়া, হিন্দু এক্সট্রিমিস্ট আখ্যা দেওয়া মনে করিয়েছে বর্তমান সেকুলার প্রোগ্রেসিভ বাঙ্গালির কথা। মনে হয়েছে ব্রিটিশরা যা শিখিয়ে দিয়ে গেছে সেটাই আমরা আউড়ে চলেছি ৭০ বছর ধরে। মনে হয়েছে নেহরু যেন ব্রিটিশদের নিজেদের সন্তান, নেহরুর বিরোধিতা করা আর ব্রিটিশ রাজতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানান একই ব্যাপার। দুজন বাঙ্গালি ব্রিটিশদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছেন, একজন নেতাজী, অন্যজন শ্যামাপ্রসাদ। মুগ্ধ হয়েছি শ্যামাপ্রসাদের বীরত্বে। খবরগুলো পড়ে চোখের সামনে দেখতে পেলাম যেন পার্লামেন্টারিয়ান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে, আয়ত দুটি চোখে যেন আগুন ঝরে পড়ছে, গলার শিরা ফুলে উঠছে, হাতের মুঠিতে প্রতিজ্ঞা। উল্টোদিকে চরম শক্তিমান রাজাধিরাজ জওহরলাল নেহরু। লড়াইটা তাঁর নিজের জন্য নয়, লড়াইটা ছিল আমাদেরই জন্য। চোখে ভেসে উঠল একটি দৃশ্য— অধুনা বাংলাদেশের বরিশালের প্রত্যন্ত একটি পাড়াগাঁ— ঝালোকাঠির সরাই গ্রাম থেকে আমার জন্মদাত্রী মা তখন তিনবছরের ক্ষুধার্ত শিশু, হপ্তাভর চড়াই উতরাই ভেঙে, স্টিমার, হাঁটা পথ, রেললাইন সবকিছু পেরিয়ে কাকার হাত ধরে কলকাতায় পা রাখছে— ভাগ্যিস! কলকাতাটা আমাদেরই ছিল। ■

*শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—*

**A Well Wisher**

**K 3N LIFESTYLES**

*With Best Compliments*

*from-*

**ANIL AHUJA**

**Ahujas Web Pvt. Ltd.**

6/47, W. E. A.

Karol Bag

New Delhi- 110005

# জয়-পরাজয়

**এষা দে**

কালিঞ্জর দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে সপ্তপ্রাসাদের একটির অন্তঃপুরে এক প্রকোষ্ঠ। উপস্থিত মাহোবা রাজ্যের প্রধান আমাত্য বলদেব, রাজজ্যোতিষী আচার্য বিদ্যার্ণব ও রাজবৈদ্য অনন্ত শাস্ত্রী। রাজা কিরাত রাই কারুকার্যশোভিত কাষ্ঠাসনে চিবুকে হাত রেখে বসে। স্পষ্টত চিন্তিত। সামনে তিনটি আসনে বাকিরা। মধ্যে মধ্যে অনন্ত প্রকোষ্ঠের কপাট খুলে ভিতরে গিয়ে ফিরে আসছেন। অমনি নারী কণ্ঠের চাপা আর্তনাদ কিছুক্ষণ বাদে বাদে ভেসে আসছে, সঙ্গে অন্য নারীকণ্ঠের সান্ত্বনা বাক্য। অনন্ত আস্তে আস্তে বলেন, 'রাজন্, উতলা হবেন না। প্রকৃতির নিয়ম, সহ্য করতেই হবে।'

রাজা সম্মতিসূচক মাথা হেলান। অনন্ত তাকান বলদেবের দিকে, নীরব ইঙ্গিত। বলদেব যেন বুঝেই শুরু করেন, ‘চারিদিকে মানুষের কার্যকলাপে উদ্বেগের অন্য অনেক কারণ নেই কি প্রভু?’

‘সেই জন্যই তো চিন্তা। গত কয়েক শত বছর ধরে বর্বরদের আধিপত্য সারা ভারত জুড়ে বেড়েই চলেছে। কত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধর্মস্থান, নালন্দা, বিক্রমশীলা ওদন্তপুরী, জগদ্দল, সোমপুরীর মতো জ্ঞানবিজ্ঞানশাস্ত্র চর্চার বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র ধ্বংস, শত শত বছরের সাধনা ফল অমূল্য সব পুঁথি অসভ্যরা অগ্নিতে ভস্ম করেছে।’

‘শুধু কি তাই মহারাজ? সাধারণ মানুষের অবস্থা ভাবুন। হিন্দু বৌদ্ধ শাসনে ফসলের পাঁচ বা ছ’ভাগ ছিল রাজাকে দেয় খাজনা। এখন তাদের দিতে হয় পঞ্চাশ শতাংশ, উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক। কৃষক স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে খাবে কী? তার ওপর মুসলমান না হলে মাথাপিছু আদায় করে জিজিয়া। কাশীর গঙ্গায় হিন্দুদের ডুব দিতে হলে লাগে তীর্থকর।’

বলদেব উত্তেজিত।

আচার্য বিদ্যার্ণব যোগ করেন, ‘পিতৃপুরুষের স্বভূমিতে আমরা আজ ধিকৃত জিম্মি। সুফি নামধারী অতি চতুর এক শ্রেণীর যবন আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনযাপন অনুকরণ করে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করছে। তাদের কাজ হলো অজ্ঞ নিম্নবর্গকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ধর্মান্তরিত করে দেশের জনবিন্যাসকে পরিবর্তন ঘটানো।’

রাজা মন্তব্য করেন, ‘শুধু রাজ্যস্থাপন, অর্থনৈতিক শোষণই এদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য, আমাদের সার্বিক অস্তিত্ব বিলোপ। তাই তো আমার এত উদ্বেগ। এ দুঃসময়ে রাজ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী চাই।’

এর মধ্যে অনন্ত দুবার উঠে কপাট খুলে ভিতরে গেছেন, আর্তনাদ তীব্র থেকে তীব্রত। প্রকোষ্ঠে সকলে না শোনার ভান করেছেন। এবারে রাজবৈদ্য ভিতরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন না। আর্তনাদ তীব্রতর ও ঘন ঘন। রাজা আসন ছেড়ে পায়চারি করতে থাকেন। এক চরম উচ্চতার শীর্ষে পৌঁছাল আর্তনাদ। হঠাৎ এক কচি গলার কান্না। মহারাজ হাতজোড় করে কপালে ঠেকান। অন্যরাও। অনন্ত ফিরে আসেন, পিছনে ঘর্মাক্ত কলেবর বয়স্কা নারী। ‘রাজন্, অপরূপ সুন্দরী কন্যা হয়েছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী।’

কন্যা! কত আশা করেছিলেন পুত্র হবে, ঘটাবে ক্ষাত্র শক্তি পুনর্জাগরণ। চান্দেল বংশের একদা বিরাট সাম্রাজ্য, স্থাপত্য শিল্পে সাহিত্যে অমর কীর্তির গৌরব আজ কোথায়? সেই সৌভাগ্য সূর্যের দ্বিপ্রহরের দীপ্তি অস্তাচলে। তিনি কিরাত রাই অবশিষ্ট একটি ক্ষীণ দীপশিখা মাত্র। এমন সঙ্কটকালে কিনা কন্যাসন্তান!

অনন্ত সামনে আসেন, ‘প্রভু নিরাশ হবেন না। মহারানি সবল সুস্থ। পরের বার পুত্র হবে। সময়টা খেয়াল করেছেন তো?’ জ্যোতিষীর উদ্দেশে প্রশ্ন। মাথা হেলান বিদ্যার্ণব। ‘অবশ্যই। যদি অপরাধ না নেন, জ্যেষ্ঠ সন্তান কন্যা পিতার সৌভাগ্যবর্ধক। যথা সময়ে নামকরণ ও কোষ্ঠি প্রস্তুত করব।’

করলেন, ‘মহারাজ, কন্যা অতি সুলক্ষণা। অসামান্য তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণধী কর্মদক্ষ। রাজরাজেশ্বরী, কীর্তিময়ী, কুলের গৌরব বর্ধনকারিণী।’

নাম হল দুর্গাবতী। যথাবিহিত রাজকন্যা আদরে যত্নে বড়ো হচ্ছেন। মহারানি আবার সন্তানসম্ভবা। আর একটি কন্যা হলো। রাজা পুত্রের আশা ত্যাগ করলেন।

এদিকে দুর্গাবতী অন্দরমহলে পুত্তলিকা বসনভূষণ নিয়ে থাকতে রাজি নন। সখীদের সঙ্গে সময় কাটাতেও তাঁর মন চায় না। উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হলে পুষ্পশোভার দিকে চোখ নেই। চড়ে বসেন সবচেয়ে উঁচু গাছটির মগডালে। ভয়ভীত সখিদের ক্রন্দনে উদ্যানরক্ষকরা দৌড়ে আসে। সর্বদা পিতার সঙ্গে তাঁর থাকা চাই। পিতারও প্রাথমিক হতাশা দূরীভূত। একেবারে দুর্গাঅন্ত প্রাণ। কন্যার আবদার, পিতা যা করবেন তাঁরও সেটাই করা চাই। না, রাজকুমারীর চোলি ঘাগরা পরিধান তাঁর অঙ্গে ওঠে না। পিতার মতো পুরুষের পরিচ্ছদ চাই। তাঁর জন্য প্রস্তুত রাজকুমারের সজ্জা। যে পোশাকে দুর্গা পিতার ছায়ার মতো অনুসরণকারী। রাজসভায় পর্যন্ত উপস্থিত। শ্রবণমাত্র কণ্ঠস্থ রাজসভার সব আলাপ-আলোচনা। তারপর পিতাকে একলা পেলেই হাজারটা প্রশ্ন। রাজকুমারের মতোই তাঁর শিক্ষার আয়োজন হলো। তার প্রখর মেধা ও স্মরণশক্তির ভূয়সী প্রশাংসাকারী রাজপণ্ডিত। শাস্ত্রাদি পাঠের পর পিতার সঙ্গে অশ্বারোহণ, তরবারি চালনা, চাঁদমারি লক্ষ্য করে বন্দুক ছোঁড়া। বনে-জঙ্গলে মৃগয়ায় সর্বদা পিতার সঙ্গে। উদ্বেগে মহারানির রাতে ঘুম নেই। বারবার অভিযোগ করেন স্বামীর কাছে, ‘প্রভু, এ তো প্রকৃতি সমাজ সবকিছুর বিরুদ্ধতা। কন্যাসন্তান পত্নী হবে, মাতা হবে, রানি হিসাবে অন্তঃপুরের দায়িত্ব পালন করবে। দুর্গা তো সেসব কিছুই শিখছে না।’

‘ও সব তুমি কমলাবতীকে শেখাও। দুর্গা আমার সাধারণ রাজকন্যা নয়। আচার্য বিদ্যার্ণব কী ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন মনে নেই? দুর্গাই আমার কুল ধন্য করবে।’

‘স্নেহে আপনি অবোধ হয়ে গেছেন।

কন্যাসন্তান কি পিতৃকুলের? তার স্থান স্বামী কুলে, শ্বশুরের বংশে, তাকে গোত্রান্তরিত হতে হয়।'

রাজা মৃদু হেসে নিরুত্তর। অব্যাহত দুর্গার পুরুষসুলভ প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশিক্ষা থেকে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে পরিচয়।

'এ যে আধুনিক বঙ্কিম।' অভ্যাসমতো কম্পিউটারে বরুণের লেখাটা পিছনে দাঁড়িয়ে পড়তে পড়তে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা স্ত্রী অরুণিমা মন্তব্য করে।

'কিন্তু এখন তো বঙ্কিম আর ফ্যাশন নয়। ঐতিহাসিক গপ্পোর বাজারই নেই। লেখকরা সর্বহারা বনবাসী সংখ্যালঘু নিদেনপক্ষে নারীর দুঃখ নিয়ে কাহিনি লেখে আর অত্যাচারী সমাজ বা রাষ্ট্রের গুষ্টির পিণ্ডি চটকিয়ে পুরস্কার লোটে।'

লিখতে লিখতে বরুণের জবাব, 'পুরস্কারের জন্য লিখি না। বিশ্বাসের জন্য লিখি। আমি মনে করি প্রত্যেকের নিজের দেশের ইতিহাস জানা উচিত। অতীতকে ভুলে গেলে কী হয় জানো তো?'

'অতীত মনে রাখবে কী করে? হিন্দুদের লেখা বংশলতিকা আর রাজাদের প্রশস্তি পড়ে? জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটল, যতটা সম্ভব তার যথার্থতার প্রমাণ নিয়ে তাকে নথিভুক্তিকরণ করাকেই বলে ইতিহাস। গ্রিক হেরেডোটাস সেই কত হাজার বছর আগে শুরু করে গেছেন। হিন্দুদের এমন অনুশাসন ছিল? আমরা তো পড়ি বিজেতার লেখা বিজিতের ইতিহাস।'

লেখা থামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বরুণ। 'আপশোষ করে লাভ নেই। তাদের চোখ দিয়েই শুরু করতে হবে।'

প্রকৃতির নিয়মে দুর্গাবতী যৌবনে পদার্পণ করলেন। ইতিমধ্যে তিরধনুক তরবারি বর্শা বন্দুক— সর্বপ্রকার অস্ত্রচালনায় দক্ষতা অর্জন হয়ে গেছে। রাজসভার কার্যকলাপে পিতার সহায়ক। রানিমা তার বিবাহের জন্য স্বামীকে বলে বলে হতোদ্যম। কিরাত রাই অপেক্ষা করে আছেন উপযুক্ত পাত্রের। মনের ভিতর গভীর বেদনা। চান্দেল বংশের অতীত গৌরব ছাড়া আর বিশেষ যৌতুক তিনি প্রাণাধিক কন্যাকে দিতে অপারগ। এমন সর্বগুণান্বিতা কন্যা, যে রূপেও কম যায় না, তাকে তো যার তার হাতে সম্প্রদান করতে পারেন না।

ভারতের রাজন্য সমাজে মাহোবা রাজকুমারীর ব্যতিক্রমী চরিত্র আলোচনার বিষয়। কেউ ভ্রূ কুঞ্চিত করেন, কেউ বা মৃদু হাসেন। কেউ আবার সখেদে বলেন, ক্ষাত্রশক্তির এমন দুরবস্থা যে নারীকে সংসারধর্ম পালনের পরিবর্তে পুরুষের ভূমিকা নিতে হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে বিবাহের কোনও প্রস্তাব আসে না। এমন সময় মধ্য ভারতের গড়কাটাঙ্গা রাজ্য থেকে এক দূতের আগমন ঘটল কালিঞ্জর দুর্গে। রাজগোণ্ড বংশের নৃপতি দলপত শাহ মাহোবা রাজকুমারী দুর্গাবতীর পাণিপ্রার্থী। দূতকে যথাবিহিত আপ্যায়ন করে প্রস্তাব বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায়দান। এখন কিরাত রাইয়ের উভয় সংকট। কন্যা তাঁর সুন্দরী, অনন্যা, যৌতুকও তেমন নেই, কিন্তু চান্দেল বংশ বলে কথা, ক্ষত্রিয় চূড়ামণি। আর গড়কাটাঙ্গা হলো গোণ্ডদের ভূমি গণ্ডোয়ানায়। তার রাজা ক্ষত্রিয়ই নন, নন রাজপুত। গোণ্ড জনজাতি থেকে বাহুবলে উত্থান। চারিদিকে পর্বত ও ঘন জঙ্গল বেষ্টিত এক রাজ্য, না আছে তেমন নগর না কালিঞ্জরের মতো দুর্গ, না সংস্কৃতি শিল্পস্থাপত্যের ঐতিহ্য।

মন্ত্রী বলদেব বললেন, 'মহারাজ, গণ্ডোয়ানার ইতিহাস অতি প্রাচীন। হ্যাঁ, গোণ্ডরা একটি বনবাসী জনজাতি, সাধারণত শিকার, পশুপালন, সামান্য কৃষি নিয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সকলেই অগ্রসর হতে চায়। গত শ'দুয়েক বছর ধরে ওরা কৃষিকাজ শিখেছে, কয়েক সহস্র বর্ধিষ্ণু গ্রাম গড়ে উঠেছে গড়কাটাঙ্গায়। এখন তো গণ্ডোয়ানা নামটাও চলে না। বিশাল পরিসর সারা মধ্য ভারত জুড়ে। তার ওপর বনজ সম্পদ অঢেল। অত্যন ধনী রাজবংশ। যেহেতু নিজেরা জনজাতি, তাই ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অতি আগ্রহী। যৌতুক এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তাছাড়া শুনেছি তরুণ রাজা সুপুরুষ, বীর, সুশাসকও।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু রাজপুত সমাজে চান্দেল বংশের সম্মানের কী হবে?'

'তুর্কিদের কৃপায় রাজপুত বলুন ক্ষত্রিয় বলুন, কারও কি আর বিশেষ সম্মান আছে? একটা কাজ করলে হয়। রাজকুমারী ব্যক্তিত্বসম্পন্না, তাঁর মতামতই সর্বাগ্রে নেওয়া উচিত নয় কি?'

নয়নের মণি কন্যার ইচ্ছাই রাজা ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা করা হলো। দুর্গাবতী জানালেন, জন্মগত পরিচয় ভাগ্যমাত্র, পুরুষের অর্জিত কীর্তিকে তিনি অধিক সমাদর করেন। রাজ গোণ্ডবংশের দলপত শাহকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি নেই।

যথাবিহিত পরিণয় অনুষ্ঠানের পর দুর্গাবতী এলেন পতিগৃহে। গড়কাটাঙ্গার রাজধানী সিংগৌরাগড়ে রাজরানি সংসারধর্ম পালন করছেন। সেই সময়ে উত্তর ভারতে তুর্কি তৈমুর বংশের বিজেতা বাবরের পুত্র হুমায়ুনকে হটিয়ে আফগান শের শাহ সুরি ক্ষমতায় আসীন। বুন্দেলখণ্ড অভিযানে কালিঞ্জর দুর্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, যে কারণে বারবার আক্রান্ত। সসৈন্যে অগ্রসর হলেন শের শাহ। যবনের ভয়ে কালিঞ্জরে ত্রাহি ত্রাহি রব। কিরাত রাইয়ের মনে সর্বদা জাগরুক গজনির সুলতান মাহমুদের অভিযানের লজ্জাকর ইতিহাস। তাঁর

শ্রেষ্ঠ পূর্বজ, খাজুরাহোর অন্যতম স্রষ্টা রাজাধিরাজ বিদ্যাধর বাধ্য হয়েছিলেন বর্বর আক্রমণকারীকে উপঢৌকনাদি দিয়ে বিদায় করতে। সেই যবন আবার উপস্থিত। এখন তাঁর সামরিক শক্তিই বা কী, আর্থিক ক্ষমতাই বা কী!
কন্যা-জামাতার কাছে সংবাদ গেল। সন্তানসম্ভবা দুর্গা নিজেই যুদ্ধের সাজ পরতে উদ্যত। তাঁকে নিবৃত্ত করে স্বামী যবনকে রুখতে পাঠালেন সেনাবাহিনি কালিঞ্জরে। তাদের আধুনিক অস্ত্র ছিল না বটে, কিন্তু সাহস এবং সংখ্যা যথেষ্ট। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধে হতচকিত শের শাহ। দুর্গে ঢুকতে না ঢুকতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মৃত্যু। বজায় রইল চান্দেলরাজের স্বাধীনতা। মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, মনে আছে কন্যা জন্মের জন্য আপনি দুঃখিত হয়েছিলেন? দেখুন, পড়ে কন্যা পাত্রে সমান দশ পুত্রে।'

কিন্তু সেই পাত্রেরই আয়ু ফুরাল। পুত্র বীরনারায়ণের বয়স পাঁচ বছর হতে না হতে দলপত শাহের জীবনান্ত। নাবালক রাজার অভিভাবক হিসাবে রাজ্য শাসনের ভার নিলেন দুর্গাবতী।

'এসব কখন হচ্ছে গো?'

'দুর্গাবতীর জন্ম ৫ই অক্টোবর ১৫২৪, বিয়ে ১৫৪২ সালে। রানি হলেন ১৫৫০ সালে। মানে ২৬ বছর বয়সে।'

তরুণী বিধবার হাতে রাজত্ব, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান সব অধিপতি পিছনে লেগে গেল। তবে দুর্গাবতীকে তারা চিনত না। এবারে চিনল। সিংহাসনে বসে প্রথমেই দুর্গা রাজধানী নিয়ে গেলেন সাতপুরা পর্বতের দুর্গম শীর্ষে চৌরাগড়ে। তৈরি হলো সারা রাজ্য জুড়ে ছোট ছোট দুর্গ। প্রজাদের চাষবাসে উৎসাহ দিতে নিজে সারা রাজ্য চষে বেড়াতে থাকেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তিতে অগণিত গ্রামপ্রধানের নাম মুখস্থ। এতকাল পশু শিকার করেই যাঁরা বেঁচে ছিলেন, এখন তাদের দিয়ে বাড়িয়ে তোলেন সেনাবাহিনীর সংখ্যা। পশুপালকদের কাজে লাগান সামরিক বাহিনীর জন্য বন্যহাতি পোষ মানাতে। প্রজাদের, গ্রামসভার সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ বিচার হয় তাঁর সামনে। অপরাধীর শাস্তি অনিবার্য, নিরপরাধের আশঙ্কা নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে মুক্তহস্ত। প্রজাদের দুঃখে দুঃখী, তাদের সুখে তাঁর সুখ। কয়েক বছরের মধ্যে দুর্গা গোণ্ড জাতির ভক্তিশ্রদ্ধায় দেবীত্বে উন্নীত। আবার তাদের অতি কাছের মানুষও। মৃগয়ার ঋতুতে রাজ্যের বিস্তৃত অরণ্যে তাঁর নিয়মিত অভিযানে সোৎসাহে প্রজামণ্ডলীর যোগদান। লোকালয়ে বাঘের উৎপাত মাত্র রানিমাকে সংবাদ দিতে দৌড়য় প্রজারা। জানে, যতক্ষণ না সেই মারক জানোয়ারকে নিজ হাতে বধ করছেন ততক্ষণ তিনি জলগ্রহণ করবেন না।

এদিকে বাইরের জগতে যথারীতি যুদ্ধবিগ্রহ আগ্রাসন চলছে। রানির প্রতিবেশী মালোয়া রাজ্যের সিংহাসনে বাজবাহাদুর নামে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক। ঘরের পাশে এমন ঐশ্বর্য আর তার মালিক কিনা এক হিন্দু বিধবা। ফৌজ সাজিয়ে ঢুকে গেলেই সোজা দখল করা যায়। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বাজবাহাদুর সেনাবাহিনী নিয়ে রানির রাজ্যে প্রবেশ করে আক্রমণ শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে পরমাশ্চর্য দৃশ্য। সমরসজ্জায় সজ্জিত স্বয়ং রানি দুর্গাবতী গোণ্ড সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে। প্রচণ্ড মার খেয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি মাথায় নিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে হলো বাজবাহাদুরকে। এক হিন্দু নারীর কাছে এমন শোচনীয় পরাজয়ে ঘটে গেল তাঁর মানসিক বিপর্যয়। রাজ্যবিস্তার দূরস্থান, এমনকি করায়ত্ত মালোয়া রাজ্য দেখাশুনাও ছেড়ে নারী সুরা আমোদপ্রমোদে নিজেকে ভুলে রইলেন। অন্য দিকে দুর্গাবতী তাঁর বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে উৎপাত সমূলে দমন করে নিজের প্রজাপালনের কর্মযজ্ঞে সমর্পিত মনপ্রাণ।

ইতিমধ্যে উত্তর ভারতে তুর্কি শাসন ও তৈমুর বংশ ফিরে এসেছে। হুমায়ুনের পুত্র আকবর সিংহাসনে। সমস্ত বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে সারা হিন্দুস্থানে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের স্বপ্ন। বাজবাহাদুর অপদার্থ শাসক, অতএব তাঁকে পরাজিত করে মালোয়া রাজ্য আকবরের ফৌজদার দখল করলেন। তুর্কি সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো রানি দুর্গাবতীর রাজ্যের সীমানা অবধি। সুশাসক ও বীরাঙ্গনা হিসাবে রানির সুনাম লোকমুখে চারিদিকে বহুল প্রচারিত। বাদশাহের কানেও পৌঁছেছে এবং কানে পৌঁছেছে তাঁর রাজ্যের বৃত্তান্ত। সত্তর হাজার কৃষিসমৃদ্ধ গ্রাম, যেগুলির মধ্যে বহু এত বৃহৎ যে শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন রানি। সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষিত বিশ হাজার অশ্ব ও সহস্র হস্তী। রাজ্যে অসংখ্য পর্বতের গুহাকন্দরে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, গহন বনে-জঙ্গলে সীমাহীন ধনরত্নের ভাণ্ডার। বন্য হস্তী রপ্তানি করে বিশাল উপার্জন। দুর্ধর্ষ তৈমুরের বংশধর জালাল উদ্দিন আকবরের মতো সর্বশক্তিমান বাদশাহেরই প্রাপ্য নয় কি এমন ঐশ্বর্য? রানির রাজধানী চৌরাগড়ের রাজসভায় উপস্থিত তাঁর দূত।

যথাবিহিত সম্ভাষণের পর সবিনয়ে নিবেদন করেন, 'মহারানি, হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহামান্য আবুল-ফথ জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর আপনার শৌর্য বীর্য ও প্রজাপালনের কৃতিত্বের খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মোহিত। এমন গুণবতী রানিকে যথাযোগ্য সমাদর জানাতে উৎসুক তিনি। বহুমূল্য অলঙ্কার

পট্টবস্ত্রাদির আয়োজন করেছেন। তাঁর ইচ্ছা আপনি স্বয়ং আগ্রায় বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাত থেকে উপঢৌকনাদি সম্মান গ্রহণ করুন। আপনার যাতায়াতের যাবতীয় বন্দোবস্ত তাঁর দায়িত্ব।'

রাজসভায় অস্ফুট সানন্দ কলরব, পারিষদরা এর ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। শুধু দুর্গাবতীর মুখে হাসি নেই। গম্ভীর মুখে রানি প্রশ্ন করলেন, 'যবন তুর্কি তৈমুর বংশের তিনি একজন নৃপতি, আমি হিন্দু রাজপুত চান্দেল বংশের রাজকুমারী, গণ্ডোয়ানা র‍্যাজরে অধিশ্বরী। তিনি কি এই পরিচয়ের জন্য আমার সাক্ষাৎ অভিলাষী?'

দূত মথা চুলকোলেন, 'আজ্ঞে তা ঠিক নয়। বাদশাহ সাধারণ এক বিদেশি শাসক নন, তিনি রাজাধিরাজ। সারা দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয়ের অনেক রাজ্য তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, হিন্দু রাজপুত অম্বর রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেছেন।'

'হ্যাঁ, কীভাবে করেছেন তাও অগোচর নয়। অম্বররাজ বিহারীমলকে আপনাদের বাদশাহের আত্মীয় প্রচণ্ড নির্যাতন করছিল। রাজা তার প্রতিকার প্রার্থনা করলে আপনাদের বাদশাহ রাজার সম্পূর্ণ বশ্যতা দাবি করেন এবং বশ্যতার প্রমাণস্বরূপ তাঁকে কন্যাদান করতে বাধ্য করেন। এবং এই তথাকথিত বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় পাত্রীর পিতার গৃহ অম্বরে নয়, সম্ভারে, পাত্রের সেনাবাহিনীর ছাউনিতে।'

দূত ক্রোধ সম্বরণ করে বলেন, 'কী ভাবে বিবাহ হয়েছে ইতিহাস ভুলে যাবে, বিবাহ সম্পন্ন সেই সত্যই থাকবে। আপনার রাষ্ট্রীয় জ্ঞানে নিশ্চয় মানবেন, এই বিবাহের ফলে সারা দেশে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সম্রাট। তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে সব রাজ্যের সমান্তরাজারা শান্তিতে রাজত্ব করছেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। তিনি চান তাঁদের মতো আপনিও বাদশাহের ছত্রছায়ায় আসুন। যেমন রানি আছেন তেমনি থাকবেন, শুধু আর সকলের মতো স্বীকার করে নেবেন বাদশাহের সার্বভৌমত্ব।'

রাজসভা নিস্তব্ধ। স্তম্ভিত মন্ত্রী, সেনাপতি কোষাধ্যক্ষ ও পারিষদবৃন্দ। দুর্গাবতীর মুখে ঘন মেঘ।

'অর্থাৎ তিনি আমার স্বাধীনতা হরণ করতে চান? কেন? কী অপরাধ আমার?'

বিপন্ন মুখে দূত বলে, 'না, না। কোনও অপরাধের কথাই নয়। বাদশাহ মনে করেন হিন্দুস্তান জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্য থাকার চেয়ে সকলের এক সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি বাঞ্ছনীয়।'

'তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা সর্বজনের মান্য এমন বিধান কার? আমি তো মনে করি আরব-তুর্কি-মোঙ্গল প্রভৃতি অর্ধবর্বর জাতিরা নিজেদের উৎসভূমিতে সভ্যতা সৃজনে অপরাগ বলেই প্রাচীন উন্নত সভ্যতাগুলি ছলেবলে কৌশলে অধিকার করে বিনাশের পথে নিয়ে চলেছে।'

রক্তবর্ণ মুখে দূত বলে, 'মহারানি, আপনি কূটনৈতিক সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করছেন।'

'সৌজন্য সমানে সমানে হয়। আপনাদের বাদশাহের চোখে আমি তাঁর অধীনস্থ। তিনি দাবি করছেন বশ্যতা, সৌজন্য নয়।'

'শেষবারের মতো বিনীত অনুরোধ করছি, আপনি নিজের এবং আপনার একমাত্র পুত্র, নাবালক রাজার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য, আপনার রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, বাদশাহের প্রস্তাবে সম্মত হোন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনার অপমানজনক কথাগুলি বাদশাহকে জানাবো না।'

'অবশ্যই জানাবেন। কারণ, রানি

দুর্গাবতী কোনওদিন বিদেশি বিধর্মীর পদতলে নিজের রাজ্যের স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে না।'

'আপনার অহঙ্কারের ফলাফল আপনার সমস্ত প্রজাকুল ভোগ করবে। আপনি নিজে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।'

'আর তৈমুরের বংশধররা চিরকাল এ মাটিতে রাজত্ব করবে?' রানির ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপের হাসি।

বিনা বিদায় সম্ভাষণে ক্রোধোন্মত্ত দূত রানির দিকে পিছন ফিরে দ্রুতপদে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত।

রাজসভার সকলে এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে দৃশ্যটির দর্শক। এখন একাধিক কণ্ঠ একযোগে কথা বলে ওঠে। মন্ত্রী হাতের ইঙ্গিতে সকলকে নীরব হতে নির্দেশ দিয়ে নিজে মুখ খোলেন।

'মহারানি, এ যে সর্বনাশ হয়ে গেল। নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে আমরা। বাদশাহী ফৌজ বিশাল, সুশিক্ষিত, তাদের হাতে পশ্চিমের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, তারা সর্বদা রণে লিপ্ত, অভিজ্ঞতায় বলুন, সমরকৌশ্যল বলুন, কার্যত আজ সারা দেশে অপ্রতিরোধ্য।' সেনাপতিও সায় দেন, 'ঠিক, ঠিক।' সভাসদরা মাথা হেলান।

দুর্গাবতী একটুক্ষণ নীরব থেকে তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'আমি এত বছর এরাজ্যের রানি। প্রথমদিন থেকে আজ অবধি রাজ্যের, প্রজাবৃন্দের কল্যাণ ছাড়া আর কিছুতে কখনও ক্ষণিকের জন্যও মন দিয়েছি কি? এমন কোনও কর্ম কি কখনো আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, যাতে প্রজাদের মঙ্গল সাধিত হয়নি?'

সমস্বরে উত্তর, 'না, রানিমা। কখনও নয়।'

'গত তিনশো বছর তুর্কি শাসনে উত্তর ভারতের অবস্থা দেখেছেন? হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন কারও সম্মান আছে? আছে তাদের কন্যা-ভগিনীদের নিরাপত্তা? আমাদের শাস্ত্রকে পদাঘাত করে হিন্দু নারীর গর্ভে মুসলমান সন্তান অহরহ জন্মাচ্ছে, হিন্দু সন্তানের মুসলমান জননীর দৃষ্টান্ত ক'টা? সবচেয়ে বড়ো কথা, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষিজীবী। জমির ফসল বাবদ মুসলমানদের ধার্য এত অধিক পরিমাণে খাজনা দিয়ে তাদের কী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে?'

সমস্বরে উত্তর, 'নেই, নেই।'

'প্রজাদের এই বর্বরদের হাতে সমর্পণ করে অবধারিত বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেব আমি রানি দুর্গাবতী?' অসম্মানের কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সসম্মানে মৃত্যুবরণ গৌরবের। আমি হয় জিতবো, নয় মরবো।'

'জয় রানি দুর্গাবতীর জয়, জয় রানি দুর্গাবতীর জয়।'

'উরিব্বাস, একেবারে ফিলমি ডায়লগ! তুমি যে গণ্ডোয়ানার রানিকে একেবারে ঝাঁসির রানি করে দিচ্ছ।' বরুণের পিছনে দাঁড়িয়ে লেখাটি পড়তে পড়তে স্ত্রীর মন্তব্য।

'আমি করছি না, দুর্গাবতী এমনই ছিলেন বাস্তবে। মুসলমানরাই লিখে গেছে।'

'বল কী! আমরা এতদিন ইতিহাসে পড়িনি কেন?'

মৃদু হাসে বরুণ, 'জিজ্ঞেস করো আমাদের তথাকথিত ঐতিহাসিকদের।'

'তারপর কী হলো?'

আগ্রায় বাদশাহের দরবার। গড়কাটাঙ্গা ফেরত দূত উপস্থিত হয়ে কুর্নিশ করেন। দৌত্যের সাফল্যে নিশ্চিত আকবার প্রসন্ন মুখে প্রশ্ন করেন, 'কবে রানি দুর্গাবতী দরবারে হাজির হচ্ছেন? তাঁকে উপযুক্ত উপঢৌকনের সঙ্গে একটা খেতাবও দেব ভাবছি, তারিখটা কী?'

অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে ম্রিয়মাণ দূত। স্বর প্রায় রুদ্ধ। আকবর অধৈর্য, 'কী হল কী? কবে আসছেন দুর্গাবতী?'

'জাঁহাপনা, তিনি আসবেন না।'

'আসবেন না! কেন?'

'জাঁহাপনা, কারণ বলতে শঙ্কাবোধ করছি।'

বিস্মিত আকবর অভয় দেন। দূত তো শুধু বার্তাবহ। অতঃপর চৌরাগড়ে রানির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আনুপূর্বিক বিবরণ। নীরবে শুনতে শুনতে বাদশাহের মুখ হিংস্র আহত শার্দূলের। আদেশ দিলেন, আক্রমণ এখনি, সর্বশক্তি দিয়ে। তবে একটা কথা, রানি দুর্গাবতীর গায়ে যেন আঁচড়টি না লাগে। তাঁকে জীবিত বাদশাহের সামনে হাজির করা চাই, একদন। এ সম্বন্ধে কোনও ভুল যেন না হয়।'

আসগর খানের নেতৃত্বে বিশাল সেনাবাহিনী গড়কাটাঙ্গায় প্রবেশ করল। রাজ্যের বন-জঙ্গল পাহাড় পর্বত, নদীনালা দুর্গাবতীর নখদর্পণে। তেমনি তাঁর সামরিক কৌশলজ্ঞান। চৌরাগড়ে নয়, তিনি শত্রুর জন্য অপেক্ষা করে রইলেন কৌশলী স্থানে, নাড়াইয়ের সঙ্কীর্ণ গিরিপথে, যার একদিকে ঘন জঙ্গলে ঘেরা পর্বতশ্রেণী আর দুদিকে নর্মদা ও গৌর নদী। বাদশাহি ফৌজের হামলা শুরু হলো। গোণ্ডদের না ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, না সমর অভিজ্ঞতা। তবু তাদের বিশ হাজার অশ্বারোহী, সহস্র হস্তী এবং জাতির সব সমর্থ পুরুষের পদাতিক বাহিনী লড়ে গেল। দু'পক্ষেই হতাহতের সংখ্যা প্রচুর। নিহত গোণ্ড সেনাপতি অর্জুন দাস। তখন রানি স্বয়ং যুদ্ধের পোশাকে তাঁর নিজের হাতির পিঠে প্রতিরোধে নামলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে গোণ্ড সেনা মরণপণ করে তাঁর

সঙ্গী। বাদশাহি ফৌজকে উপত্যকায় বেরিয়ে আসতে হলো। রানিও বেরিয়ে এসে তাদের তাড়িয়ে সমরাঙ্গন থেকে হটিয়ে দিলেন। জঙ্গলে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো ফৌজ। উৎসাহিত রানি তাঁর মন্ত্রী দেওয়ান পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনীর অধিনায়কদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন, 'শুনুন, এখনই আমরা এগিয়ে যাই, পিছন থেকে বাদশাহি ফৌজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

মন্ত্রী দেওয়ান সেনাপ্রধানরা সকলে একবাক্যে বলে ওঠেন, 'সে কি!'

'কেন, অসুবিধা কোথায়?' রানির প্রশ্নের উত্তরে বাকিরা প্রায় সমস্বরে বলেন, 'রানিমা সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, রাত্রি নেমে গেছে। এখন সব সেনার বিশ্রামের সময়। কাল সূর্যোদয়ে নবোদ্যমে রণ শুরু হবে।'

রানি বিরক্ত মুখে বলেন, 'সূর্যোদয় সূর্যাস্ত মেনে যুদ্ধ! আপনারা কি মহাভারতের যুগে বাস করেন? এটা কুরু-পাণ্ডবের লড়াই নাকি? যুদ্ধের নিয়মকানুন মেনে একই পরিবারের একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে? বাদশাহের ফৌজ কাদের নিয়ে জানেন না? আফগান, উজবেক, তাজিক ইস্পাহানি আরব, হাজার হাজার বিদেশি ভাড়াটের দল। তাদের লক্ষ্য যেনতেন প্রকারে শত্রু নিধন করে প্রাণ ভরে লুণ্ঠন।'

বয়স্ক দেওয়ান বলেন, 'তাঁরা তো মানুষ, আজ সারা দিন তাদের পরিশ্রম তো আমাদের সেনার চেয়ে কম হয়নি।'

মন্ত্রী মান ঠাকুর প্রধানদের দিকে চেয়ে বলেন, 'সব সেনারাই ক্লান্ত নয় কি?'

সম্মতিসূচক মাথা হেলান তাঁরা। রানি প্রশ্ন করেন, 'আর ওরা যদি রাতের মধ্যে তাদের বিশাল বন্দুক যাকে কামান বলে, সেগুলো নিয়ে আসতে পারে তখন কাল কী হবে? আমাদের কামান আছে?'

'এই ঘোর অন্ধকারে অজানা বনজঙ্গল পাহড়ের মধ্যে দিয়ে অত ভারী ভারী অস্ত্র ওরা আনা নেওয়া করতে পারবেই না।' দেওয়ানের বিজ্ঞ মত। মান ঠাকুর তাল দেন, 'প্রশ্নই ওঠে না।' সেনাপ্রধানরা নীরব।

'তাহলে এটাই আপনাদের সকলে সুচিন্তিত মত, কাল প্রভাতের আগে যুদ্ধ নয়?' উপদেষ্টারা মাথা হেলান, হ্যাঁ। খানিকক্ষণ নীরব থেকে গম্ভীর মুখে দুর্গাবতী বলেন, 'বেশ তবে তাই হোক।'

অতঃপর নিশাবসান। দিনের আলো ফোটে। দুপক্ষের সেনা মুখোমুখি হতে না হতে শোনা গেল কামানের গর্জন। রাতের অন্ধকার, দুর্গম পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে বাদশাহি ফৌজ কামান এনে উপস্থিত করে ফেলেছে। এখন নবোদ্যমে নবোৎসাহে তাদের সংগ্রাম অসম শত্রুর সঙ্গে। দুর্গাবতী নিজের হাতি শরমনের পিঠে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর কিশোর পুত্র বীরনারায়ণও মায়ের সঙ্গে সংগ্রামে রত। কামানের গোলার সামনে তিরধনুক বর্শা তরবারি ক'টা বন্দুক কী করবে! তবু বাদশাহি ফৌজ দু-দুবার পিছু হটতে বাধ্য হলো। বীর নারায়ণ আহত। তৎক্ষণাৎ রানি তাকে অর্ধেক হস্তী বাহিনীর পাহারায় নিরাপদ চৌরাগড়ের দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিজে বাকি বাহিনী সঙ্গে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ চালালেন। আরও একবার বাদশাহি ফৌজ পিছু হটতে বাধ্য হলো।

ফৌজদার আসগর খান দেখলেন রানিকে কাবু করতে না পারলে যুদ্ধে জয় শক্ত। এদিকে বাদশাহের হুকুম তাঁকে জীবিত দরবারে হাজির করতে হবে। আদেশ দিলেন প্রাণে না মেরে তাঁকে আহত করতে। রানিকে লক্ষ্য করে ঘোড়সওয়ারদের চারিদিক থেকে আক্রমণ শুরু হলো। একটি তির এসে বিঁধল দুর্গাবতীর কানের তলায় কণ্ঠে। যুদ্ধ করতে করতেই তিনি টান মেরে তিরটি তুলে ফেললেন। আরেকটি এবার বিদ্ধ করল তাঁর ললাট। সেটিও তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তপাত ও যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের জন্য। জ্ঞান ফিরতে তিনি দেখলেন দ্রুত ধেয়ে আসছে ফৌজের রিসালাদারেরা। দুর্গাবতী মাহুতকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘকাল আমার সঙ্গী, তুমি জানো এ অবস্থায় তোমার কর্তব্য কী। আমাকে বধ কর।'

মাহুত উত্তর দিল, 'এ আদেশ কী করে মানবো রানিমা? যে হাতে সারা জীবন আপনার কাছ থেকে এত কিছু গ্রহণ করেছি, সেই হাতে আপনার প্রাণ নেবো! অসম্ভব। এ হাতি অতি দ্রুতগতি। বরং আপনাকে আমি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কাপুরুষ!' গর্জে উঠে রানি নিমেষের মধ্যে ছুরিকা বের করে নিজের বক্ষে বসিয়ে দিলেন। শহিদ হলেন দুর্গাবতী।

'ইস্ কী ট্রাজিক! এ সব ঐতিহাসিক ঘটনা? তারিখ জানো?'

'নিশ্চয়, ২৪ জুন, ১৫৬৪।'

'তারপর কী হলো?'

'গোণ্ড সেনারা তাদের রানির মতো আমৃত্যু চালিয়ে গেল সংগ্রাম। বাদশাহি ফৌজ চৌরাগড় দখল করতে গেলে দুর্গাবতীর কিশোর পুত্রও মাতৃপদ অনুসরণ করে প্রতিরোধের যুদ্ধে প্রাণ দিল। গোণ্ড রাজাদের কয়েক শত বছরের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার লুণ্ঠন করল বিজয়ী তুর্কি ফৌজদার। নিয়ে গেল রণহস্তীগুলিও। তবে তার সবটাই খোদ বাদশাহের প্রাপ্তি হলো কিনা সে বিষয়ে কতক সন্দেহ। অতঃপর গড়কাটাঙ্গা আকবরের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। গোণ্ড জাতির যে বিকাশ কয়েক শত বছর আগে শুরু হয়ে দুর্গাবতীর প্রয়াসে বিশেষ দ্রুতগতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তার গতি স্তব্ধ। বরং তাদের আদিম অস্তিত্বে পুনর্যাত্রা। ক্রমে বহিরাগতের আগমনের চাপে হাজার হাজার বছরের বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে চারিদিকের অন্যান্য রাজ্যে প্রান্তিক জনজাতিতে পর্যবসিত। হিন্দুস্তানের জনমানস থেকে নিশ্চিহ্ন দুর্গাবতীর নাম।

কেটে গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী। কালের অবধারিত নিয়মে একদিন পালাবদল। ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে নতি স্বীকারের পর প্রবলপ্রতাপান্বিত তুর্কি বাদশাহ জালালউদ্দিন আকবরের উত্তরাধিকারী ভারতভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

অতঃপর সেই মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ইংরেজদের একজন যাঁরা শুধু শোষণেই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন না, ছিলেন এ দেশের মানুষের প্রকৃত রক্ষক, তেমনি এক ব্যতিক্রমী পুরুষ এলেন মধ্য ভারতে, গোণ্ডদের একদা রাজ্যে। ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন অরণ্যে পাহাড়ের তলায় সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ও দুটি নদীর মধ্যে এক সমাধি। সঙ্গী গ্রামবাসীরা সসম্ভ্রমে জানাল, তাদের রানি দুর্গাবতীর সমাধি। কে এই রানি? শুনলেন তাঁর কাহিনি, যে কাহিনি গোণ্ডরা সব হারিয়েও সযত্নে মনের মণিকোঠায় রক্ষণ করে এসেছে, শুনিয়েছে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে প্রতি প্রজন্মকে জাতির গৌরবগাথা। ইংরেজ দেখল রানির সমাধির দুই দিকে দুটি বিশাল গোলাকার ঢাকের আকৃতির প্রস্তরখণ্ড।

'অদ্ভুত তো!' একজন গ্রামবাসী জানায়, 'ও দুটি রানিমার রাজডঙ্কা। শত্রু দেখা দিলেই সেনাদের ডাকার জন্য বাজানো হতো। উনি এইখানেই অস্ত্র হাতে বীরগতিপ্রাপ্ত হন। তাই ডঙ্কাদুটিও পাথর হয়ে তাঁর সঙ্গে রয়েছে।'

প্রকৃতি ও মানুষের কি আশ্চর্য সংযোগ, জড় পদার্থেরও কি অনুভূতি সম্ভব, বিস্মিত ইংরেজ মনে মনে ভাবেন। বহু বছর বাদে এ অঞ্চলে কাজে এসে আবার দর্শন করতে এলেন দুর্গাবতীর সমাধি। তার সামনে দাঁড়িয়ে স্মরণ করলেন রানির অমর কাহিনি। সমাধির চারিপাশে ছড়িয়ে আছে বিচিত্র বর্ণের সব স্ফটিক খণ্ড, এ মাটিতে প্রকৃতির দান। কয়েকটি তুলে নিয়ে রাখেন সমাধিতে। তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

'এজন্যই বাঙালিকে বাকি ইন্ডিয়ানরা সাহেবের চামচা বলে। কী দরকার ছিল সাহেবকে আনার?' পাঠিকা অরুণিমার মন্তব্য।

'আমি জানি না। এনেছে ইতিহাস। এ সাহেব কে জানো? স্যার মেজর জেনারেল উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান।'

'ইনি কি সেই স্লিম্যান যিনি বহু বছর ধরে জনগণের ত্রাস খুনি-ডাকাত ঠগিদের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে আমাদের রক্ষা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, সেই স্লিম্যান ভারতে তাঁর ভ্রমণ ও বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে আদান-প্রদানের ওপর দারুণ বইও লিখে গেছেন। সেখানেই এই শ্রদ্ধাঞ্জলিটি লিপিবদ্ধ। নিজে বীরপুরুষ ছিলেন, তাই মর্যাদা দিয়ে গেছেন বীরাঙ্গনাকে। আজ দেশ স্বাধীন, রানি দুর্গাবতীর মূর্তি জব্বলপুরে, তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত, হয়েছে স্মৃতিসৌধ, তাঁকে নিবেদিত সংরক্ষণাগার। তাঁর নামে রাজ্যের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়, দূরপাল্লার ট্রেন। ২৪ জুন তাঁর শহিদত্বের স্মরণে ভারত সরকার প্রকাশ করেছেন বিশেষ ডাকটিকিট।'

'সব ভালো যার শেষ ভালো।'

'শেষ আর হলো কই?' বরুণ মৃদু হেসে আবার লেখে।

নাড়াইয়ের পর্বত বনজঙ্গল ঘেরা সংকীর্ণ গিরিপথে আকবর বাদশাহের ফৌজের সঙ্গে দুর্গাবতীর সেই অসম রণে যে অগণিত গোণ্ড সেনা সংগ্রাম করে মৃত্যু বরণ করেছিল তারা সব শায়িত তাঁর চারিধারে। গ্রামবাসীরা শোনে কোনও কোনও নিশুতি রাতে দুর্গাবতীর রাজডঙ্কা বেজে ওঠে। ডাক দেয় মাটির তলায় অশরীরি সেনাদের, 'বীরগণ জাগো, ওঠ, শত্রু নিধন কর। জাগো ওঠ, জাগো, জাগো...' ▮